সাতঘরিয়া ও অন্যান্য গল্প

প্রফুল্ল রায়

প্রমা

৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ। কলকাতা-১৭।

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৫১

প্রকাশক : সুরজিৎ ঘোষ
প্রমা প্রকাশনী / ৮, ওয়েস্ট রেঞ্জ / কলকাতা-১৭

মুদ্রক : গীতারাণী ঠাকুর
জেনুইন প্রিন্টার্স, ৮৮এ, শ্যামপুকুর স্ট্রীট, কলকাতা-৪

প্রচ্ছদ শিল্পী : সুবোধ দাশগুপ্ত

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু

এই লেখকের অন্যান্য বিশিষ্ট গ্রন্থ

প্রফুল্ল রায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প
সুখের পাখি অনেক দূরে
নোনা জল মিঠে মাটি
মহাযুদ্ধের ঘোড়া
কেয়াপাতার নৌকো
সিন্ধুপারের পাখি
আমার নাম বকুল
আকাশের নীচে মানুষ
ভাতের গন্ধ
আলোয় ফেরা
পূর্বপার্বতী

সূচী

সাতঘরিয়া

মনপত্থল গাঁয়ের সামনের দিকে সরকারী পাকা সড়ক ; এখানে যাকে বলে পাক্কী। পেছনে দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাত। কোয়েল এখন নামেই নদী। এই জেঠ মাহিনা অর্থাৎ জষ্ঠি মাসে বাদামী বালির পাহাড়ের তলায় যে জলটুকু রয়েছে তাতে হাঁটুও ডোবে না।

মনপত্থল জল-অচল অচ্ছুৎদের গাঁ। এর উত্তর দিকে থাকে ধাঙডেরা, দক্ষিণে গঞ্জুরা, পশ্চিমে দোসাদরা।

ভোরবেলা দোসাদটোলার চাঁপিয়া কোয়েলের হাঁটুভর পানিতে নাহানা (স্নান) সেরে নিজের ধসে-পড়া কোমর-বাঁকা ঘরটার দাওয়ায় বসে আছে। আর থেকে থেকেই থুতনি তুলে চনমন করে দূরে পাক্কীর দিকে তাকাচ্ছে। ঐ সড়কটা ধরে পুব দিক থেকে নাটোয়ারের আসার কথা।

এত ভোরে গঞ্জুটোলা ধাঙড়টোলা বা দোসাদটোলার কারো ঘুম ভাঙেনি। তবে ধাঙড়পাড়ার পাল পাল শুয়োর এর মধ্যেই খাদ্যের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। জানবরগুলোর পেটে সারাক্ষণ রাহুর খিদে। শুয়োর ছাড়া আর যারা জেগেছে তারা হল পাখি। ঝাঁক ঝাঁক পরদেশী শুগা আর চোটা পাখি ডানায় বাতাস চিরে চিরে পাক্কীর ওধারে ধু-ধু মাঠের দিকে উড়ে যাচ্ছে।

মনপত্থলের যে ধারেই তাকানো যাক, পরাস আর সিমার গাছের

ছড়াছড়ি। তিন মাস আগে সেই যে গাছগুলো থোকায় থোকায় লাল ডগডগে ফুল ফোটাতে শুরু করেছিল, এখনও ফুটিয়েই যাচ্ছে। আর আছে সফেদিয়া গোলগোলি এবং মনরঙ্গোলি গাছের অজস্র ঝোপ। প্রত্যিটি ঝোপের মাথায় শুধু ফুল আর ফুল।

মনুষ্যজাতির সব চাইতে নিচের স্তরের যে অংশটি সারা পৃথিবী থেকে ভয়ে ভয়ে দূরে সরে এসে এই মনপথলে ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে তাদের কেউ এই মুহূর্তে জেগে থাকলে, চাঁপিয়াকে দেখে একেবারে হাঁ হয়ে যেত।

হুসাদিন চাঁপিয়ার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। গায়ের রঙ পোড়া ঝামার মতো। চুল উঠে উঠে কপালটা প্রকাণ্ড মাঠ হয়ে গেছে। নাকটা খাটো এবং চাপা। থুতনিতে কাটা দাগের মতো খাঁজ। মোটা ভুরু, খসখসে চামড়া। তবু লক্ষ্য করলে টের পাওয়া যায়, চাঁপিয়ার লম্বাটে মুখে এককালে খানিকটা ছিরিছাঁদ ছিল। এই বয়সেও তার চোখদুটো বড় সরল, বড় নিষ্পাপ এবং টানা টানা। বিশ পঁচিশ সাল আগে যখন চাঁপিয়া সবে নঈ যুবতী হয়ে উঠছে সেই সময় গঞ্জু-টোলার ফেকুমল প্রায়ই বলত, তার চোখ নাকি বনহরণা অর্থাৎ বনহরিণীর মতো। ছোকরা ছিল বেজায় ফুর্তিবাজ, আমুদে। নৌটঙ্কীর দলে গান গাইত আর আজীব আজীব কথা বলে লোককে তাক লাগিয়ে দিত।

বনহরণার মত চাঁপিয়ার চোখ হোক বা না হোক, তার গায়ে ছিল বনভৈসীর তাকত। অসীম শক্তি আর অফুরন্ত স্বাস্থ্যই তাকে জীবনের লম্বা অনেকগুলো বছর এই পৃথিবীতে টিকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু তিন বছর আগে খারাপ জাতের চেচকে (বসন্তে) চাঁপিয়ার অটুট শরীর ভেঙে গেছে। কণ্ঠার হাড় গজালের মতো ফুঁড়ে বেরিয়েছে। মুখে, ঘাড়ে, গলায় বসন্তের কালো কালো দাগ। হাতের শিরগুলো দড়ি হয়ে চামড়ার তলা থেকে ফুটে উঠেছে। আজকাল দুব্‌লা শরীরে অল্পতেই হাঁফ ধরে যায় তার।

একটা রোগা ভাঙাচোরা চেহারার আধবুড়ি দুসাদিনের দিকে তাকিয়ে গঞ্জুরা, ধাঙড়রা বা দোসাদরা নিশ্চয়ই হাঁ হয়ে যাবে না। তাদের অবাক হবার কারণ হল চাঁপিয়ার সাজগোজ। এই মুহূর্তে তার পরণে বাদরার ছাই (এক ধরনের ক্ষার) দিয়ে কাচা পরিষ্কার রঙিন একটা শাড়ি আর খাটো জামা। চোখে কাজলের লম্বা টান। চুলগুলো কাঠের কাকাই দিয়ে চুড়ো করে বেঁধে চারপাশে মনরঙ্গোলি ফুল বসিয়ে দিয়েছে। কপালের মাঝখানে মেটে সিঁদুরের ফোঁটা। গলায় চাঁদির হার, কানে চাঁদির করণফুল, হাতে চাঁদির কাঙনা। গত তিন সাল বড় কষ্ট গেছে চাঁপিয়ার, বহোত তখলিফ। কতদিন পেটে দানা পড়েনি, বিলকুল ভুখা থাকতে হয়েছে। তবু প্রাণ ধরে চাঁদির এই গয়না ক'টা সে যে বেচতে পারেনি তার কারণ একটাই। হাজার দুঃখেও চাঁপিয়ার আশা বা স্বপ্ন ছিল জীবনে আরো একবার সে সাজতে পারবে। আজ তার সেই সাজার দিন।

সেই পনের বছর বয়স থেকে এখন পর্যন্ত মোট ছ'বার এভাবে সেজেছে চাঁপিয়া। মনপথলের অচ্ছুতেরা তাকে শেষবার সাজতে দেখেছে পাঁচ সাল আগে। সেবার চাঁপিয়া তার ছ'নম্বর মরদের ঘর করতে যায়।

মনপথলকে ঘিরে দশ বিশটা গাঁয়ে চাঁপিয়ার আরেক নাম ছেঘরিয়া অর্থাৎ চল্লিশ বছরের জীবনে মোট ছ'টি পুরুষের ঘর করেছে সে আজ পর্যন্ত।

ঘরের দাওয়ায় বসে ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠতে থাকে চাঁপিয়া। চারপাশের দোসাদটোলা, গঞ্জুটোলা, ধাঙড়টোলা, ঝাঁক ঝাঁক পরদেশী পাখি, পাল পাল শুয়োর, সিমার বা পরাস গাছের মাথায় থোকা থোকা আগুন, অনেক দূরে ধু-ধু ফাঁকা মাঠ—কোনোদিকেই লক্ষ্য নেই তার। পাকা সড়কের ওপর চাঁপিয়ার দুই চোখ স্থির হয়ে আছে।

কথা আছে, দু'মিল (দু'মাইল) পূবের ছোট টৌন ডকিলাগঞ্জ থেকে সূর্য উঠবার ঢের আগেই নাটোয়ার এসে তাকে নিয়ে সোজা

চলে যাবে আড়াই 'কোশ' পশ্চিমে সুরথপুরার হাটে। নাটোয়ার তারই স্বজাত অর্থাৎ কিনা দোসাদ। বয়স কমসে কম পঞ্চাশ হবেই। ভকিলগঞ্জে এক ঠিকাদারের কাছে দিনমজুরিতে মাটি কাটে। ও দিকটায় এখন সড়ক তৈরির কাজ চলছে। তার জন্যই মাটি কাটা।

দেখতে দেখতে চারদিক দ্রুত ফর্সা হতে থাকে। অনেক, অনেক দূরে আকাশ যেখানে পিঠ বাঁকিয়ে দিগন্তে নেমেছে ঠিক সেইখানে লাল টকটকে সূর্যটা একটু একটু করে মাথা তোলে। ধাঙড়, গঞ্জু আর দোসাদটোলা থেকে মানুষজনের গলা ভেসে আসে। টের পাওয়া যায় মনপত্থল গাঁ জাগতে শুরু করেছে।

সূরয উঠে গেল, অথচ এখনও নাটোয়ারের দেখা নেই। তবে কি সে আসবে না? ভাবতেই বুকের ভেতর চল্লিশ বছরের দুব্‌লা হৃৎপিণ্ড থমকে যায় চাঁপিয়ার। চোখ জলে ভরে যেতে থাকে। নাটোয়ার দোসাদ না এলে তার এত সাজ ব্যর্থ হয়ে যাবে।

আরো খানিকক্ষণ পর সূর্য যখন দিগন্তের তলা থেকে লাফ দিয়ে ওপরে উঠে আসে, সেই সময় দেখা যায় পাক্কী ধরে নাটোয়ার এদিকেই আসছে। বুকের ভেতর থমকানো হৃৎপিণ্ড বিপুল বেগে ছোটাছুটি শুরু করে। খুশিতে চোখমুখ চকচকিয়ে ওঠে চাঁপিয়ার।

একটু পর ডাইনে এবং বাঁয়ে ধাঙড় আর গঞ্জুটোলা রেখে দোসাদ-টোলায় ঢুকে পড়ে নাটোয়ার। তারপর সামনের সিমার আর পরাস গাছগুলোর তলা দিয়ে সোজা চাঁপিয়ার কাছে এসে দাঁড়ায়। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত সাজের বাহার দেখতে দেখতে শুধোয়, 'কা রে চাঁপিয়া, রিডি?' 'রিডি' মানে রেডি। চাঁপিয়া প্রস্তুত হয়ে আছে কিনা তা জানতে চাইছে নাটোয়ার। ঠিকাদারদের কাছে কাজ করে করে দু-চারটে আংরেজি বুলি শিখে ফেলেছে সে। কথায় কথায় হরদম সেগুলো বেরিয়ে আসে।

'হাঁ—' আস্তে ঘাড় হেলিয়ে দেয় চাঁপিয়া। নাটোয়ারের দিকে ভাল করে তাকাতে পারে না সে। পনের ষোল বছরের নঈ যুবতী সে

আর নেই। তবু তার বুক সুখে এবং লজ্জায় থির থির করে কাঁপতে থাকে।

'আমার আসতে থোড়া দের হয়ে গেল।'

চাঁপিয়া কী উত্তর দেবে, ভেবে পেল না।

নাটোয়ার ফের বলে, 'আর দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে। সুরয চড়ে যাচ্ছে। জলদি চল্। সুরথপুরার হাটিয়ায় পেঁ ৗছতে দুফার হয়ে যাবে।'

আবছা গলায় চাঁপিয়া বলে, 'থোড়া ঠার যাও।' বলেই তার ভাঙাচোরা ফুটোফাটা ঘরের ভেতর ঢুকে একটা পুঁটলি নিয়ে বেরিয়ে আসে। পুঁটলিটা কাল রাতেই বেঁধে ছেঁদে রেখেছিল সে। ওটার ভেতর রয়েছে তার যাবতীয় পার্থিব সম্পত্তি। মোট খান দুই সেলাই-করা খাটো বহরের শাড়ি, তিনটে ছেঁড়া জামা, একটা কাঁথা, একটা কম্বল আর সিলভারের তোবড়ানো দু-তিনটে থালা-গেলাস।

নাটোয়ার পুঁটলিটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে শুধোয়, 'এটা নিয়ে যাবি?'

'হাঁ—'চাঁপিয়া মাথা নাড়ে।

'ঠিক হ্যায়। চল্—'

কয়েক পা এগিয়ে একবার পেছন ফেরে চাঁপিয়া। হেলে-পড়া টুটাফুটা ঘরটা একবার দেখে নেয়। এটা তার বাপের ঘর। অবশ্য বাপ আর বেঁচে নেই; কবেই মরে ফৌত হয়ে গেছে। শুধু কি বাপ, মা-বোন কেউ নেই তার। এক ভাই ছিল; সাদির পর অনেক দূরের ভারী টৌন ঝরিয়ায় চলে গেছে। সেখানে কয়লা খাদানে কাজ করত। দশ-বিশ সাল তার কোনো খবর পায় না চাঁপিয়া। মরে গেছে কি বেঁচে আছে, কে জানে।

বাপের এই ঘর থেকে এই প্রথম যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি কাঁখে নিয়ে একজন মরদের পিছু পিছু চলে যাচ্ছে না চাঁপিয়া। আগেও ছ ছ'বার ছ'টি পুরুষের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। যাবার সময় প্রতিবারই মনে মনে বলেছে, 'হো রামজী, হো কিষুণজী, আর যেন আমাকে

বাপের ঘরে ফিরতে না হয়।' কিন্তু দো সাল, চার সাল পরপরই ছে-ঘরিয়া চাঁপিয়াকে ফিরে আসতে হয়েছে।

এবার হল সপ্তম বার। ঘরটা দেখতে দেখতে মনে মনে হাতজোড় করে রামচন্দজী এবং কিষুণজীর উদ্দেশে চাঁপিয়া প্রার্থনা জানায়, এই যেন তার শেষ যাওয়া হয়।

নাটোয়ার তাড়া লাগায়, 'কি রে, দাঁড়িয়ে গেলি যে। দের নায় করনা—'

'নায়—'মুখ ফিরিয়ে নাটোয়ারের পিছু পিছু আবার হাঁটতে শুরু করে চাঁপিয়া। যেতে যেতে লক্ষ্য করে, হট্টাকট্টা চেহারার আধবুড়ো নাটোয়ারের সাজের বহরও আজ কম না। এমনিতে তার যা কাজ তাতে একরকম সারা দিনই মাটি মেখে পিরেত সেজে থাকে। কিন্তু আজ এর মধ্যেই সারা গায়ে প্রচুর তেল মেখে 'নাহানা' সেরে নিয়েছে নাটোয়ার। মাথায় এত কড়ুয়া তেল ঢেলেছে যে এখনও কপাল বেয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নামছে। তার পরনে ক্ষারে-কাচা সফেদ ধুতি আর লাল জামা। পায়ে কাঁচা চামড়ার ভারী জুতো, কানে পেতলের মাকড়ি। কাঁধের ওপর নতুন কোরা গামছা।

দোসাদটোলা পেছনে ফেলে গঞ্জু আর ধাঙড়টোলার ভেতর দিয়ে দু'জনে এগিয়ে যেতে থাকে। এর মধ্যে মনপথল গাঁয়ের যাদেরই ঘুম ভেঙেছে দুলহনের সাজে চাঁপিয়াকে দেখে তারা তাজ্জব বনে যায়। জিজ্ঞেস করে, 'কা রে চাঁপিয়া, নয়া মরদ মিলল হো ?'

মুখে কিছু বলে না চাঁপিয়া। চোখ নামিয়ে আস্তে মাথা নাড়ে শুধু।

'এবার তা হলে সাতঘরিয়া হবি!'

চাঁপিয়া চুপ।

মনপথলের বয়স্ক মানুষজনেরা তার হিতাকাঙ্ক্ষী। তারা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পরামর্শ দেয়, 'দেখিস, এই সাদিটা যেন টুটে না যায়।'

এর আগে ছ ছ'বার সাদি হয়েছে চাঁপিয়ার। ছ'বারই ভেঙে

গেছে। মনে মনে তার ইচ্ছা, শ্মশানে না চড়া পর্যন্ত এই সাদি যেন অটুটই থাকে। হো রামজী, হো কিষুণজী, তেরে কিরপা।

একসময় দু'জনে মনপথল গাঁ থেকে বেরিয়ে সোজা পাক্কীতে এসে ওঠে; তারপর সুরথপুরা হাটের দিকে যেতে থাকে। গাঁয়ের ভেতর দিয়ে যখন আসছিল তখন দু'জনে আগে-পিছে হাঁটছিল। যে মরদের সঙ্গে এখনও সাদি হয়নি, গাঁয়ের মানুষের চোখের সামনে তার গা ঘেঁষে চলা যায় নাকি? শরম লাগে না? এই শরমটা নাটোয়ারের মধ্যেও কাজ করছিল খুব সম্ভব। গাঁয়ের ভেতরে বরাবর চাঁপিয়ার কাছ থেকে খানিকটা ফারাক রেখে চলেছে সে। কিন্তু পাকা সড়কে জান-পয়চান কেউ নেই। এখানে চাঁপিয়ার পাশাপাশি হাঁটতে অসুবিধা কোথায়?

চলতে চলতে বার বার সঙ্গিনীর দিকে তাকায় নাটোয়ার। চাঁপিয়াও তার সঙ্গীকে আড়ে আড়ে দেখতে থাকে। এভাবে মাঝে মাঝে দু'জনের চোখাচোখি হয়ে যায়।

হাজার হোক, চাঁপিয়া একটা রক্তমাংসের জীবন্ত আওরত। মনুষ্যজাতি সম্পর্কে তার বিপুল অভিজ্ঞতা। নাটোয়ারের তাকানো দেখে এক লহমায় বুঝে নেয়, তাকে 'পুরুখ' বা পুরুষটার মনে ধরেছে।

চাঁপিয়ার মনে পড়ে, প্রথম বার ছাড়া বাকি পাঁচ বারই এইভাবে একটা করে পুরুষের সঙ্গে সুরথপুরার হাটে গেছে। প্রথম বার যেতে হয়নি, তার কারণ তখন বাপ বেঁচে ছিল। সে-ই চারপাশের দশ-বিশটা তালুক চষে মনপসন্দ একটা ছেলে খুঁজে এনে তার সাদি দেয়। বিয়ের পর মনপথল থেকে আট 'মিল' উত্তরে হাথিয়াগঞ্জে মরদের ঘর করতে চলে যায় চাঁপিয়া।

জীবনের প্রথম 'পুরুখ' মুঙ্গীলাল ছিল বড়ই সাদাসিধে ভালমানুষ গোছের আদমী। সংসারে সে আর তার একটা বুড়ি পিসী ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। এক রাজপুত ক্ষত্রিয়ের জমিতে মুঙ্গীলাল ছিল কামিয়া অর্থাৎ খরিদী কিষাণ। তার নানা জমিমালিকের কাছ থেকে কোরা

কাগজে অঙ্গুঠাব ছাপ মেরে টাকা করজ নিয়েছিল। সে টাকা নিজে আর শোধ করে যেতে পারেনি। ফলে বাকি জীবন নানাকে মালিকের জমিতে স্রেফ পেটভাতায় ঘাড় গুঁজে খেটে যেতে হয়েছে। নানার পর বাপ মৃত্যু পর্যন্ত ঐ মালিকেরই জমি চষে গেছে। তারপর মুঙ্গীলালের পালা। কিন্তু সুদে-আসলে করজের টাকা ফুলেফেঁপে এতই বিরাট হয়ে উঠেছে যে তিনপুরুষ ধরে অবিরত খেটেও শোধ করা যাচ্ছিল না।

সাদির পব চাঁপিয়াকেও মালিকের ক্ষেতির কাজে লাগিয়ে দিয়েছিল মুঙ্গীলাল। দু'জনে খেটে যত তাড়াতাড়ি কামিয়াগিরি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, এই ছিল তার ইচ্ছা। কিন্তু দুটো সাল ঘুরতে না ঘুরতেই দশ দিনের 'বোখারে' হঠাৎ মরে গেল মুঙ্গীলাল। মরদের মৃত্যুশোক সামাল দিয়ে উঠতে না উঠতে মালিকের মুনশী আধবুড়ো পিঠবাঁকা চিমসে চেহারাব টেড়াবাম সহায় একদিন রাত্রে তার কাছে এসে ফিস-ফিসিয়ে একটা প্রস্তাব দেয়। সে তাকে 'রাখনি' (রক্ষিতা) কবতে চায়। এমনি এমনি মুফতে না। রীতিমত সপরনার (সাজসজ্জা) জিনিস দেবে। নয়া শাড়ি দেবে, চাঁদির গয়না দেবে, এ ছাড়া পাইসা-রুপাইয়া তো আছেই।

অচ্ছুৎ ভূমিদাসদের ঘবের যুবতী মেয়েদের মালিক এবং তাদের লোকেরা চিরদিন ভোগদখল করে এসেছে। আবহমান কাল ধরে এ অঞ্চলে এ একটা চালু প্রথা। এর বিরুদ্ধে কেউ কখনও মাথা তুলে দাঁড়ায়নি। কিন্তু চাঁপিয়া অন্য ধাতের তেজী মেয়ে। তা ছাড়া মুঙ্গীলালের শোকটা তখনও তার মনে বড়ই টাটকা। আচমকা তার মাথায় কী যেন হয়ে যায়। 'বুড়হা গিধ, তুহারকা মুহ্‌মে থুক থুক থুক—'গালাগাল দিয়ে এবং টেড়ারামের মুখে গুনে গুনে তিন বার থুতু ছিটিয়েই চাঁপিয়ার হুঁশ হয়, হাথিয়াগঞ্জে আর থাকা ঠিক হবে না। টেড়ারাম তাকে নির্ঘাত খুন করে ফেলবে।

একমুহূর্তও না দাঁড়িয়ে চাঁপিয়া রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে শুরু করে এবং

রাতারাতি ক্ষেতির পর ক্ষেতি পেরিয়ে সোজা মনপত্থলে বাপের ঘরে ফিরে আসে।

বাপ গণপৎ দোসাদ কমজোরী মানুষ। সে ছিল মরসুমী কিষাণ। ধান কি গেঁহু চাষের সময় আর ফসল কাটার মরসুমে দেড় আর দেড় মোট তিনটে মাস সে কাজ পেত। বাকি ন' মাস দক্ষিণ কোয়েলের পাড়ে যে মাইলের পর মাইল জুড়ে জঙ্গল পড়ে আছে সেখান থেকে সুথনি (এক জাতীয় কন্দ), রামদানা, মেটে আলু বা মহুয়ার গোটা তুলে এনে খেয়ে জীবন বাঁচাত। মুঙ্গীলালের সঙ্গে সাদির আগে বাপের পিছু পিছু খাদ্যের খোঁজে কতবার সে ঐ জঙ্গলটায় গেছে। হাথিয়াগঞ্জ থেকে ফেরার পর রোজই সেখানে যেতে লাগল চাঁপিয়া।

দিন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু চাঁপিয়ার বরাত এমনই, মুঙ্গীলালের মৃত্যুর পর ছ'মাস ঘুরল না, বাপটা মরে ফৌত হয়ে গেল।

দুব্‌লা হোক, বুড়হা হোক, হাজামজা হোক, তবু মাথার ওপর একটা বাপ ছিল। সে চোখ বোজার পর রাতের অন্ধকারে কারা যেন ঘরের বেড়া আঁচড়াত আর চাপা গলায় বলত, 'দরবাজা খোল চাঁপিয়া। তোর জন্যে লাড্ডুয়া এনেছি, বুনিয়া এনেছি, চাঁদির করণফুল এনেছি—'

বাপ মরার পর থেকেই শিয়রের কাছে একটা বাঁকানো দা নিয়ে শুতো চাঁপিয়া। দা'টা বাগিয়ে বিছানায় উঠে বসে সে গলার শির ছিঁড়ে চেঁচাত, 'ভাগ যা চুহাকা ছৌয়ারা। নইলে জানে খতম হয়ে যাবি।'

কিন্তু উৎপাতটা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিল। অতিষ্ঠ চাঁপিয়া শেষ পর্যন্ত মনপত্থলের পঞ্চ-এর কাছে গিয়ে নালিশ জানায়। 'পঞ্চ'-এর যে মাথা সে হল গঞ্জুটোলার বুড়ো ধানপত। সব শুনে সে বলেছিল, যুবতী ছোকরির অরক্ষিত থাকা ঠিক না। চাঁপিয়ার উচিত তুরন্ত আরেক বার সাদি করে ফেলা। বেশির ভাগ 'পুরুখে'র (পুরুষের) মধ্যেই রয়েছে একটা করে জানবর। চাঁপিয়ার শরীরে এবং মনে

তাকত কতটুকু ? জানবরেরা তাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে।

ধানপত ভালো লোক, বহোত সাচ্চা আদমী। তার কথাগুলো ফেলে দেবার মতো নয়। চাঁপিয়া বলেছিল, 'লেকেন আমি এক-ঘরিয়া রাণ্ডী, আমাকে কে সাদি করবে ?'

ধানপত বলেছিল, 'কা তাজ্জবকা বাত ! আমাদের অচ্ছুতিয়াদের ঘরে একঘরিয়াদের নতুন করে সাদি হয় না ! কেত্তে দোঘরিয়া চার-ঘরিয়া দশঘরিয়া চুমৌনা (সাঙ্গা) করে সম্‌সার করছে।'

কথাটা চাঁপিয়ার অজানা নয়। দোসাদ সমাজের যাবতীয় প্রথাই সে জানে। নিজের দ্বিতীয় বার সাদির প্রসঙ্গে ঠিক ওভাবে সে বলতেও চায়নি। দ্রুত শুধরে নিয়ে সে এবার বলেছে, 'জানি চাচা। লেকেন আমি একটা লেড়কী, মাথার ওপর বাপ নেই। কোই ভি নায়। লোকের দরজায় দরজায় ঘুরে কি বলতে পারি আমাকে সাদি কর ! শরমকা বাত।'

'তুই রাজি থাকলে বল্। আমি ব্যওস্থা করব।'

'তোমার যা 'আচ্ছা' মনে হয়, কর।'

কয়েক দিনের মধ্যেই পাশের তালুক ভুধলিগঞ্জ থেকে আধবুড়ো এক দোসাদকে এনে হাজির করেছিল ধানপত। লোকটার নাম চৌপটলাল। দু'জনের আলাপ টালাপ করিয়ে দিয়ে ধানপত জানিয়েছিল, চৌপট পাক্কীতে সাইকেল রিকশা চালায়। আগে দু'বার বিয়ে করেছে। এক বউ মারা গেছে বোখারে, আরেক বিয়ে 'ছুট' হয়ে গেছে। ছেলেপুলে নেই, ঝাড়া হাত-পা লোক। চাঁপিয়াও তা-ই। এই চুমৌনা হলে দু'জনের পক্ষেই ভালো।

চাঁপিয়া মুখ নামিয়ে ধানপতকে শুধিয়েছে, 'চাচা, রিকশ গাড়িয়াটা কি ওর নিজের ?'

চৌপটলাল প্রশ্নের উত্তরটা ধানপতকেই দিয়েছে, 'ওকে বলে দাও চাচা, ওটা মালিকের। রোজ চার রুপাইয়া তাকে কেরায়া দিতে হয়। তারপর যা থাকে সেটা আমার কামাই।' একটু থেমে ফের

বলেছে, 'আউর একগো বাত ধানপত চাচা।'

ধানপত জানতে চেয়েছে, 'কা বাত ?'

'তোমাদের লড়কীকে জানিয়ে দাও, আমার কামাইয়ের দিকে যেন নজর না দেয়। চুমৌনা হলে নিজের পেটের দানা নিজেকেই ওর জুটিয়ে নিতে হবে। আমার পেটের সওয়াল আমার, ওর পেটের সওয়াল ওর। রাজি হলে এ চুমৌনা হবে।'

'লেকেন তোর ঘরে গিয়ে নয়া জায়গায় চাঁপিয়া নিজের ব্যওস্থা কী করে করবে ?'

'সেটা আমি দেখব। রাজি কিনা তুমি 'পুছে' নাও—'

ধানপত উত্তর দেবার আগেই চাঁপিয়া বলে উঠেছে, 'আমি রাজি।' আসলে একা একা থাকতে তার সাহস হচ্ছিল না ; একটি পুরুষের আশ্রয় তার প্রয়োজন ছিল।

এবার সোজাসুজি তার দিকে তাকিয়ে চৌপটলাল বলেছে, 'তা হলে কাল সুবে সাফা কাপড়া টাপড়া পরে থেকো। আমি এসে তোমাকে নিয়ে যাব।'

ধানপত শুধোয়, 'কোথায় নিয়ে যাবি ?'

চৌপটলাল বলে, 'সুরথপুরার হাটিয়ায়।'

'সেখানে কী ?'

চৌপটলাল যা উত্তর দেয় তা এই রকম। তখন চাষের মরসুম। চারপাশের দশ বিশটা গাঁয়ের যত জমির মালিক আছে, তাদের সবার ক্ষেতিমজুর দরকার। সুরথপুরার হাটিয়ায় এ অঞ্চলের তাবত ভূমিহীন মেয়েপুরুষ এই সময়টা গিয়ে জড়ো হয়। জমির মালিকেরা তাদের ভেতর থেকে শক্তসমর্থ দেখে মজুর বেছে নিয়ে যায়। তেমন তেমন খাটিয়ে হলে মালিকের কাছে সালভর কাজ পাওয়া যায়। কাজের বদলে মেলে চাল, গেঁহু বা বজরা আর নগদ কিছু পাইসা। চাঁপিয়াকে যদি পসন্দ করে কোনো জমির মালিক কাজ দেয়, চৌপটলাল তাকে নিজের ঘরে নিয়ে তুলবে।

ধানপতের সন্দেহ হয়েছিল। সে শুধিয়েছে, 'তোর মতলব কী রে? চাঁপিয়াকে রাখনি বানিয়ে ঘরে বসাতে চাস?'

তাড়াতাড়ি জিভ কেটে কানে হাত দিয়ে চৌপটলাল বলেছে, 'নায় নায় চাচা। ওরকম পাপকা চিন্তা মনে এনো না। তোমাদের লডকী ক্ষেতিমালিকের কাম পেলেই চুমৌনার ব্যাওস্থা করে ফেলব। তারপর, ওকে ঘরে নিয়ে যাব। তবে একটা কথা—'

'কা?'

'কাম না পেলে কিন্তু চুমৌনা হবে না। তোমাদের লড়কীকে সুরথ-পুরার হাটিয়া থেকে ফিরে আসতে হবে।'

ধানপতকে বিষণ্ণ দেখিয়েছিল। চাঁপিয়ার দিকে ফিরে সে শুধিয়েছে, 'কা রে, রাজি? ভাল করে ভেবে ছাখ।'

চাঁপিয়া বলেছে, 'ভাবনার কিছু নেই। আমি রাজি।'

কথামত পরের দিন ভোরে কোয়েলের হাঁটুভর জলে 'নাহানা' চুকিয়ে সেজেগুজে গয়না পরে নিজের ঘরে দাওয়ায় বসে থেকেছে চাঁপিয়া। মুঙ্গীলালের সঙ্গে পয়লা সাদির সময় বাপ অনেক চাঁদির গয়না দিয়েছিল। সে সব নিয়ে আসতে পারেনি সে। এক কাপড়ে তাকে মুঙ্গীলালদের গাঁ থেকে পালিয়ে আসতে হয়। পরে অবশ্য বুড়ি পিসশাশুড়ি তার কাপড়জামা গয়নাগাটি, সব কিছু নিজে এসে দিয়ে গেছে।

যাই হোক, সুরয উঠবার আগেই চৌপটলাল এসে চাঁপিয়াকে সঙ্গে করে সুরথপুরার হাটে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে এক ক্ষেতি-মালিক তাকে দেখামাত্র পছন্দ করে ফেলে এবং সালভর কাজের ব্যবস্থা পাকা হয়ে যায়।

চৌপটলাল মরদকা ছোয়া। তার বাত হাতীকা দাঁত। ঐ হাটিয়া-তেই অচ্ছুতিয়াদের বামহন ডেকে চুমৌনা সেরে নয়া বহুকে নিয়ে তুধলিগঞ্জে চলে যায়।

চৌপটলালের সঙ্গে তার বিবাহিত জীবনের আয়ু মোট চার

সাল। এই ক'টা বছর মোটামুটি ভালই কেটেছে। শর্তানুযায়ী চৌপটলাল আর চাঁপিয়া নিজের নিজের পেটের দানা যোগাড় করত। তাদের জীবনে কোনোরকম ওঠানামা ছিল না। রোজ ভোরে উঠে বাসি রোটি কি পানিভাত্তা (পান্তাভাত) খেয়ে চুলা ধরিয়ে কালোয়া (তুপুরের খাবার) বানিয়ে নিত চাঁপিয়া। তুটো তোবড়ানো সিলভারের কটোরায় কালোয়া ভরে একটা দিত চৌপটলালকে, একটা নিত নিজে; তারপর তু'জনে চলে যেত তু'দিকে। চাঁপিয়া মালিকের খামারে কিংবা ক্ষেতিতে। চৌপটলাল যেত সাইকেল রিকশা নিয়ে পাক্কীতে। সারাদিন পর রাত্রিবেলা তু'জনের দেখা হত। গরম গরম মাড়ভাত্তা বা লিট্টি বানিয়ে খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে ঘন হয়ে পাশাপাশি শুয়ে ঘরের ফুটো ছাউনির ফাঁক দিয়ে আকাশ আর তারার মেলা দেখতে দেখতে কত যে গল্প করত চৌপটলাল!

চাঁপিয়ার এই চার বছরের বিবাহিত জীবনের একটা বড় ঘটনা হল এক মরা বাচ্চার জন্মদান। এটুকু বাদ দিলে মনে হচ্ছিল, দিন এভাবেই কেটে যাবে।

কিন্তু চার সাল বাদে এদিকে এমন মারাত্মক খরা হল যে মাইলের পর মাইল সব চাষের জমি টুটেফুটে গেল। না এক ফোঁটা মেঘ, না এক বুঁদ বারিষ। আকাশের চেহারা দেখে এদিকে আদৌ কোনোদিন যে বৃষ্টি নামবে, এমন ভরসা পাওয়া গেল না। জল না হলে চাষও নেই। ক্ষেতিমালিক জানিয়ে দিল, সে আর চাঁপিয়াকে রাখতে পারবে না।

কাজটা চলে যাবার পর চৌপটলাল নিরানন্দ মুখে বলেছিল, 'মনমে বহোত তুখ হচ্ছে। তবু কথাটা তোকে বলতেই হয়।'

'কা?' ভয়ে ভয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়েছে চাঁপিয়া।

'তুই মনপথলে ফিরে যা।'

'ফিরে যাব!'

'হুঁ।' বিষণ্নভাবে মাথা নেড়েছে চৌপটলাল, 'তোর কাম নেই, কামাই বন্দ্‌। এই খরার সময় মানুষের পয়সা নেই; কেউ রিকশ গাড়িয়ায় চড়তে চায় না। দিনভর আমার যা কামাই তাতে আমারই চলে না। তুই থাকলে দু'জনেই ভুখা মরে যাব।'

অগত্যা কাটান-ছাড়ান হয়ে গেল। নিজস্ব জামাকাপড় আর চাঁদির গয়নাগুলো নিয়ে চোখের জলে বুক ভাসাতে ভাসাতে আবার মনপথলে ফিরে এল চাঁপিয়া।

বাপের ঘরটা অনেকদিন ফাঁকা পড়ে ছিল। মানুষজন না থাকায় হাঁটুভর ধুলোবালি আর জঞ্জাল জমে উঠেছিল সেখানে। সাগুয়ান কাঠের খুঁটিতে ঘুণ ধরে এমন ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল যে ঘরটা হুড়মুড় করে যে কোনো সময় পড়ে যেতে পারত। জঞ্জাল সাফ-সুতরো করে, জঙ্গল থেকে কাঠ জুটিয়ে এনে খুঁটিগুলো বদলে নিয়েছিল চাঁপিয়া।

এরপর একটা বছর বড়ই কষ্টে কেটেছে তার। চৌপটলালদের ওখানেই শুধু খরা হয়নি, মনপথলের চারপাশের চল্লিশ পঞ্চাশটা তালুকের তাবত জমি রোদে জ্বলে গিয়েছিল। বারিষের অভাবে চাষবাস যখন বন্ধ তখন চাঁপিয়ার মতো মানুষদের কাজও বন্ধ। কাজেই দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতের দু'ধারের জঙ্গলটাই ওদের একমাত্র ভরসা। সেখান থেকে রোজ মহুয়ার গোটা, রামদানা আর সুথনি যোগাড় করে এনে সে সব সেদ্ধ করে খেয়ে কীভাবে যে পুরা একটা সাল কাটিয়ে দিয়েছে তা একমাত্র চাঁপিয়াই জানে। তার জীবনীশক্তি যে প্রবল, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। নইলে এই সব কচুঘেঁচু আগাছা খেয়ে কেউ বেঁচে থাকতে পারে!

এক বছর বাদে আকাশের দেওতা মুখ তুলে চাইল। জেঠ মাহিনা শেষ হতে না হতেই চারপাশ ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গেল। চাঁপিয়া আকাশের দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে মাথায় ঠেকিয়েছে আর বলেছে, 'হো রামজী, হো কিষুণজী, তেরে কিরপা। কাম মিললে ভাত খেতে-

পাব। এক সাল ভাতের মুখ দেখি না।'

চাঁপিয়া ঠিক করে ফেলেছিল, দু-এক রোজের ভেতর সুরথপুরার হাটে গিয়ে সেই কড়াইয়া গাছগুলোর তলায় বসবে। ওখান থেকেই চারপাশের ক্ষেতি মালিকেরা মরসুমী কিষাণ জুটিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু যেদিন সে হাটে যাবে তার আগের দিন পাশের গাঁ হাতিয়াড়া থেকে জগন দোসাদ এসে হাজির। সুরথপুরার হাটে ধানচালের আড়তে সে মাল বয়। জগন বলেছিল, 'হামনি শুনা হ্যায়, তুহারকা ঘরমে মরদ নেহী। চৌপটলালের সাথ তোর সাদি টুটে গেছে।'

জগন দোসাদকে ছোটবেলা থেকেই চিনত চাঁপিয়া। 'বাপ বেঁচে থাকতে প্রায়ই মনপথলে আসত সে। চাঁপিয়া ঘাড় কাত করে জানিয়েছিল, 'হুঁ।'

'আমার ঘরেও জেনানা নেই। তোর মন হলে আমার ঘরে আসতে পারিস। মগর—'

জগন দোসাদের প্রস্তাবটা বুঝতে অসুবিধা হয় না চাঁপিয়ার। একটা তাগড়া তাকতওয়ালা জোয়ান মরদ যেচে এসে তাকে বিয়ের কথা বলছে শুনেও বুকের ভেতরটা উথলপাথল হয়ে ওঠে না। শান্ত চোখে জগনের দিকে তাকিয়ে নিরুত্তাপ গলায় সে শুধিয়েছে, 'মগর কা?'

জগন এবার যা বলেছে তা এইরকম। চাঁপিয়াকে সে নিজের ঘরে নিয়ে যেতে পারে একটিমাত্র শর্তে। কামাই করে নিজের পেটের দানা তাকে জোটাতে হবে।

এমন শর্ত চাঁপিয়ার অজানা নয়। এই কড়ারেই আগের বিয়েটা হয়েছে তার। সে বলেছে, 'ঠিক হ্যায়।' এ দেশের নিয়ম এবং সংস্কার অনুযারী চাঁপিয়া বুঝে নিয়েছে, সব ঔরতের জন্যই একটা করে পুরুখের প্রয়োজন। সে খেতে পরতে না দিক, অন্য নিরাপত্তার জন্যও তাকে একান্ত দরকার। মেয়েদের পক্ষে একা বেওয়ারিশ পড়ে থাকা খুবই বিপজ্জনক।

জগন এবার খুশি হয়ে বলেছে, 'এহী সাল আসমানে ঘটা দেখে ক্ষেতিমালিকেরা সুরথপুরার হাটিয়ায় কিষাণ নিতে আসছে। ওখানে গেলেই কাম জুটে যাবে।'

'জানি। আমি কাল সুরথপুরা যাব।'

জগনের উৎসাহ এবার দশগুণ বেড়ে গিয়েছিল। সে বলেছে, 'কাল সুবে তোর এখানে চলে আসব। হামনিলোগন একসাথ সুরথ-পুরায় চলে যাব।'

'ঠিক হ্যায়।'

'তোর কাম জুটলে তোকে আমার ঘরে নিয়ে যাব।'

পরের দিন ভোরে সুরয উঠবার আগে মনপথলের তাবত মানুষ দেখল চাঁপিয়া আরো একবার সেজেগুজে হাতিয়াড়া গাঁয়ের জগন দোসাদের পিছু পিছু সুরথপুরার হাটে চলেছে।

কড়াইয়া গাছের তলায় গিয়ে বসতে না বসতেই কাজ জুটে গিয়েছিল চাঁপিয়ার। ফলে চৌপটলাল যা যা করেছে এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। জগন কোত্থেকে এক টিকিওলা পণ্ডিত ধরে এনে নগদ পাঁচ টাকা দক্ষিণা দিয়ে বিয়েটা চুকিয়ে ফেলে। তারপর চাঁপিয়াকে নিয়ে সিধা নিজের ঘরে চলে যায়।

চাঁপিয়ার এই তিন নম্বর বিয়ের আয়ু পুরো দু সালও নয়। পয়লা বছর ঘুরতে না ঘুরতেই পেটে ছৌয়া এসে গেল। কিন্তু সে জন্য কাজ বন্ধ করা যায় না। নায় কাম তো নায় খোরাকি। কাজেই ন'মাস পর্যন্ত বাচ্চা পেটে নিয়ে মালিকের ক্ষেতিতে কাজ করে গিয়েছিল চাঁপিয়া। তাতে যা হবার তাই হয়েছে। একদিন মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল সে। রক্তাক্ত বেহুঁশ চাঁপিয়াকে একটা গৈয়া গাড়িতে তুলে বিশ মাইল তফাতের এক টৌনে নিয়ে হাস-পাতালে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে তিন মাস মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে যখন সে বেরুল, শরীর বেজায় কমজোরি হয়ে গেছে। পেটের ছৌয়াটা তো আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। হাসপাতালের

ডাগদরসাব জানিয়ে দিয়েছে, তার আর ছোয়া হবে না। সে জন্য খুব একটা দুর্ভাবনা ছিল না। চাঁপিয়ার ভয় তার শরীরটাকে নিয়ে। এই শরীর যদি একবার ভেঙে পড়ে, কাজকর্মের অযোগ্য হয়ে যায়, ভুখা মরে যেতে হবে।

হাসপাতাল থেকে বেরুবার পর সত্যি সত্যি বড় দুব্‌লা হয়ে গিয়েছিল চাঁপিয়া। ক্ষেতির কাজ তো দূরের কথা, একসঙ্গে দশ পা চলতে তার হাঁফ ধরে যেত। ফলে জমির কাজটা তার গেল। আর যে ঔরত নিজের পেটের দানা জুটিয়ে নিতে পারে না, তাকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবার মতো সৌখিন লোক জগন নয়। কাজেই চাঁপিয়ার তিন নম্বর বিয়েটাও টিকল না। নিজস্ব কাপড়জামা এবং অন্যান্য জিনিসপত্র গুছিয়ে আবার মনপথলে ফিরে এল সে।

এরপর আরো তিনবার সেজেগুজে তিনজনের পিছু পিছু সুরথপুরার হাটিয়ায় গেছে চাঁপিয়া—সেই একই শর্তে। অর্থাৎ ক্ষেতির কাজ পেয়ে পেটের দানা জোটাতে পারলে তবেই সাদি হবে। কিন্তু তার চার পাঁচ এবং ছ' নম্বর বিয়েও বেশি দিন টেকেনি। কোনোটা দো সাল, কোনোটা চার সাল, কোনোটা বা এক সাল। চার নম্বর বিয়েটা ভাঙল দক্ষিণ কোয়েলের বাঁড়ের জন্য। বন্যায় চাষের জমি ডুবে যাওয়ায় ক্ষেতিমালিক কাজ থেকে তাকে ছাড়িয়ে দেয়। সুতরাং বিয়েও বরবাদ। পাঁচ নম্বর বিয়েটা চৌপট হল মরদ মরে যেতে। ছ নম্বর বিয়ে ভাঙল অজন্মার জন্য।

তারপর এই পড়তি বয়সে চেচকে-ভোগা অশক্ত দুর্বল ভাঙ্গা শরীরে জীবনের সাত নম্বর মরদ নাটোয়ারের সঙ্গে সুরথপুরায় চলেছে চাঁপিয়া।

আচমকা পাশ থেকে নাটোয়ারের গলা কানে আসে, 'এ ঔরত—'

এতক্ষণ দূরমনস্কর মতো হেটে যাচ্ছিল চাঁপিয়া। চমকে সে ঘাড় ফেরায়। বলে, 'কা ?'

'সাফ সাফ দো-চারগো বাত তুহারকা সাথ হয়ে যাক।'

চাঁপিয়া উত্তর দেয় না। তবে কান খাড়া করে অপেক্ষা করতে থাকে।

এদিকে ঝাঁ-ঝাঁ করে জেঠ মাহিনার বেলা চড়ে যাচ্ছে। রোদের ঝাঁঝ দ্রুত চড়তে থাকে। বাস-ট্রাক, সাইকেল-রিকশা, গৈয়া এবং ভৈসা গাড়ির চলাচলও অনেক বেড়ে গেছে। হাইওয়েতে লাল ধুলো উড়িয়ে চাঁপিয়াদের পাশ দিয়ে সেগুলো একের পর এক বেরিয়ে যেতে থাকে। এখন রাস্তায় মানুষজনও প্রচুর।

নাটোয়ার বলে, 'আমার পেটে একেবারে দশগো জানবরের খিদে।'

চাঁপিয়া অবাক হয় না। নাটোয়ারের আগে যে ক'জনের সঙ্গে সে সুরথপুরার হাটিয়ায় গেছে তারা প্রায় সবাই এ কথা বলেছে। পেটে জানোয়ারের খিদে নিয়ে সবাই তাকে সাদি করতে আসে। যাই হোক, চাঁপিয়া কিছু বলে না।

তীক্ষ্ণ চোখে নাটোয়ার এবার চাঁপিয়ার দিকে তাকায়। তার কথা ঔরতটার কানে ঠিক ঠিক ঢুকেছে কিনা, সে সম্বন্ধে কিছুটা সন্দেহ হয়। সে শুধোয়, 'শুনা হামনিকো বাত ?'

নিচু গলায় চাঁপিয়া বলে, 'শুনা হ্যায়।'

'আমার যা কামাই তাতে আমার পেটটাই শুধু চলে। সুরথ-পুরায় গিয়ে কাম তোকে জোটাতেই হবে।' নাটোয়ার শেষ কথাগুলোর ওপর যথেষ্ট জোর দেয়।

এ জাতীয় কথাও চাঁপিয়ার কাছে নতুন কিছু নয়। শান্ত মুখে সে বলে, 'জানি।'

এবার ডান হাতের আঙুল নেড়ে উথলে-ওঠা স্বরে নাটোয়ার বলে, 'তব্ হাঁ—'

ঈষৎ কৌতূহল নিয়ে চাঁপিয়া সঙ্গীর দিকে তাকায়। জিজ্ঞেস করে, 'কা ?'

'তোর কামটা হয়ে গেলে একটা সাদির মতো সাদি করব। সবাই একেবারে তাজ্জব বনে যাবে।'

এই বয়সে জীবনের সাত নম্বর সাদিতে কতটা ঘটা হওয়া সম্ভব, চাঁপিয়া ভেবে পায় না। তবু নাটোয়ারের এই উচ্ছ্বাস একেবারে মন্দ লাগে না। বুকের ভেতর ঠাণ্ডা ঝিমানো রক্ত একটু যেন ছলকেই ওঠে তার।

হাঁটতে হাঁটতেই চাঁপিয়ার কাপড়চোপড় লক্ষ্য করে নাটোয়ার। শাড়ি আর জামা যদিও পরিষ্কার, তবে বহুকালের পুরানো। নানা জায়গায় পিঁজে পিঁজে গেছে ; দু-চারটে তালিও চোখে পড়ে। নাটোয়ার জোরে জোরে মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, 'নায় নায়, এহী কপড়া-উপড়া চলবে না। সুরথপুরায় গিয়ে দুকান থেকে এ্যায়সা জগমগ জগমগ কাপড়া আউর জামা কিনে দেব যে লোকের আঁখ ধাঁধিয়ে যাবে—হাঁ!'

আগে আর এ জাতীয় কথা কেউ কখনো বলেনি। আশায় সুখে এবং উত্তেজনায় চাঁপিয়ার বুকের ভেতরটা দুলে ওঠে। নাটোয়ার তার উত্তেজনাটা আরেকটু উসকে দেয়। সে ফের বলে, 'বিলাইতি পাউডেল (পাউডার), সিন্নুর (সিঁদুর), খুসবুদার তেল ভি কিনে দেব। আর কী কী দেব জানিস ?'

'কা ?'

'চাঁদির বিছুয়া, করণফুল, পৈড়ী, কজরৌটি—'

বাধা দিয়ে মৃদু গলায় চাঁপিয়া বলে, 'আমার তো এসব আছে। আবার নতুন করে—'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিতে দিতে নাটোয়ার বলে, 'তুই আমার ঘরে নয়া যাচ্ছিস। তোকে কিছু দিতে আমার ইচ্ছা করে না ? হাঁ কি নায়— বাতা, বাতা—'

চোখ নামিয়ে চাঁপিয়া বলে, 'হাঁ।'

'তোকে নাজুক সুনহলা দুলহানিয়া বানিয়ে ঘরে নিয়ে তুলব। বিলকুল পরী য্যায়সা—'

চড়া রঙে চাঁপিয়ার চোখের সামনে ঝকমকানো স্বপ্নের একটি

ছবি আঁকতে আঁকতে নাটোয়ার তাকে নিয়ে একসময় সুরথপুরায় পৌঁছে যায়।

সুরথপুরা হাটের দক্ষিণ দিক ঘেঁষে যে বারো চোদ্দটা কড়াইয়া গাছ গা-জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে তার তলায় বরাবর যেমন হয়, এবারও তেমনি মরসুমী ভূমিহীন ক্ষেতমজুররা জমা হয়েছে। তা পুরুষ এবং ঔরত মিলিয়ে দু-আড়াই শ লোক তো হবেই। মেয়েমানুষগুলোর বেশির ভাগেরই কোলে দু-একটা বাচ্চা ঝুলছে।

নাটোয়ার আর চাঁপিয়া সিধা সেখানে চলে আসে। ক্ষেতমজুরদের জটলাটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে নাটোয়ার বলে, 'তুই ওখানে গিয়ে বোস।'

চাঁপিয়া শুধোয়, 'তুমি ?'

নাটোয়ার বলে, 'আমি আর বসব না। দুকান থেকে চায়-পানি খেয়ে আসি।' তারপর আশ্বাস দিয়ে বলে, 'ডর নেই, একাই খাব না। তোর জন্যেও নিয়ে আসব।'

নাটোয়ার দাঁড়ায় না। হাটের যে দিকটা দোকানপাট দিয়ে সাজানো এবং মানুষের ভিড়ে জমজমাট সিধা সেখানে চলে যায়। আর আস্তে আস্তে চাঁপিয়া ক্ষেতমজুরদের পাশে গিয়ে বসে।

তার চারপাশে যারা বসে আছে তাদের প্রায় সবাইকেই চেনে চাঁপিয়া। এদের কেউ দোসাদ, কেউ গঞ্জু, কেউ তাতমা, কেউ ধোবি, কেউ মুসহর। মোট কথা জাতপাতের দিক থেকে পুরাপুরি অচ্ছুৎ। এই জল-অচলরা ছাড়াও আর যারা আছে তারা হল আদিবাসী মুণ্ডা, ওঁরাও, সাঁওতাল ইত্যাদি ইত্যাদি।

হাটের এই অংশটা ফাঁকা ফাঁকা ; লোকজনের ভিড় কম। আসল হাট হলো খানিকটা তফাতে—উত্তর দিকটায়। সেখান থেকে ভনভনে মাছির মতো একটানা আওয়াজ আসছে।

আবছাভাবে নিজের চারপাশের ক্ষেতমজুরদের দিকে একবার তাকায় চাঁপিয়া। পরক্ষণেই তার নজর গিয়ে পড়ে সামনের চালাঘর-গুলোর তলায়। হাটের চালা হলেও ওখানে আজকাল দোকান টোকান বসে না ; ওগুলো বাতিল করে হাটটা দূরে সরে গেছে।

পরিত্যক্ত চালাগুলোর তলায় এই মুহূর্তে এ অঞ্চলের ক্ষেতমালিক এবং তাদের লোকজনেরা বসে আছে। বোঝা যায়, এখনও মজুর বাছাবাছি শুরু হয়নি।

দুব্‌লা শরীরে মনপথল থেকে এতটা হেঁটে আসার জন্য হাত-পা যেন ভেঙে আসছিল চাঁপিয়ার। তার ওপর এখন পর্যন্ত পেটে কিছুই পড়েনি। ক্ষ্যাপা জন্তুর মতো খিদেটা ধারাল দাঁতে পাকস্থলীটা যেন ক্রমাগত ফেঁড়ে ফেঁড়ে দিচ্ছে। নাটোয়ার অবশ্য ভরসা দিয়েছে, তার জন্য চায়-পানি নিয়ে আসবে। দেখাই যাক।

ক্ষেতমজুররা এধারে ওধারে কথা বলে যাচ্ছে। বাচ্চাকাচ্চাগুলো কেউ চিল্লাছে, কেউ লাল ধুলো মেখে ছুটোপাটি করছে। চাঁপিয়া কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছে না। এখন তার একটাই চিন্তা। যেভাবেই হোক, ক্ষেতির কাজ তাকে পেতেই হবে। মনে মনে বিড়বিড়িয়ে সে অনবরত বলতে থাকে, 'হো রামজী, হো কিষুণজী, অব তেরে কিরপা।'

আচমকা পেছন থেকে কে যেন ডেকে ওঠে, 'কৌন—চাঁপিয়া ?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় চাঁপিয়া। হাত দশেক ফারাকে বসে আছে আধবুড়ো গৈবীনাথ। তাকে দেখামাত্র চমকে ওঠে চাঁপিয়া। চেহারার এ কী হাল করেছে লোকটা !

এখন থেকে অনেক সাল আগে প্রথম যেবার কাজের আশায় এই কড়াইয়া গাছগুলোর তলায় এসে চাঁপিয়া বসেছিল সেই তখন থেকেই গৈবীনাথকে চেনে সে। তারপর যত বার এখানে এসেছে তত বারই লোকটাকে দেখেছে। পাথর কি লোহা দিয়ে তৈরি ছিল তার শরীর। গায়ে ছিল দশটা বনভয়সার তাকত। ওকে দেখামাত্র জমিমালিকদের

পছন্দ হয়ে যেত।

গৈবীনাথ জাতে ধোবি। অনেক সাল ধরে দেখাশোনার ফলে তার সঙ্গে খানিকটা ঘনিষ্ঠতাই হয়েছে চাঁপিয়ার। অন্য ক্ষেতমজুররা যখন নিজের নিজের ধান্দা ছাড়া আর কিছু বোঝে না তখন গৈবীনাথের সঙ্গে দেখা হলেই সে তার খোঁজখবর করেছে; নতুন নতুন মরদদের কথা জানতে চেয়েছে। খুঁটিয়ে খুটিয়ে একের পর এক বিয়ে ভাঙার কারণগুলো জেনে আন্তরিক দুঃখ এবং সহানুভূতি জানিয়েছে। লোকটা এক কথায় খুবই বড়মাপের দিলওয়ালা আদমী।

মাঝখানে তিন সাল সুরথপুরায় আসতে পারেনি চাঁপিয়া। এর ভেতর লোহা বা পাথরে বানানো গৈবীনাথের চেহারাটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে যেন। গাল তুবড়ে চোয়ালের হাড় ফুটে বেরিয়েছে। গায়ে মাংস বলতে কিছুই নেই। পাঁজরাগুলো গুনে নেওয়া যায়। দেহের ঐ বিশাল কাঠামোটায় এখন শুধু হাড্ডি আর হাড্ডি। চোখদুটো এক আঙুল করে গর্তে ঢুকে গেছে। চামড়া ঢিলে হয়ে কুঁচকে গেছে। থেমে থেমে হাঁ করে একেক বার শ্বাস নেয় সে আর হাঁপায়। দেখেই বোঝা যায়, ফুসফুসের সঙ্গে বাইরের বাতাসের যোগাযোগ রাখতে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে গৈবীনাথের। অথচ কী এমন বয়েস! বড় জোর পঁচাশ কি তার চাইতে দু-এক সাল বেশি। কিন্তু এখন গৈবীনাথকে দেখে মনে হয় বয়েসটা সত্তর কি আশী পেরিয়ে গেছে।

চাঁপিয়া বলে, 'তুম!'

'হাঁ রে—' গৈবীনাথ এগিয়ে এসে তার পাশে বসে।

'এ কী চেহারা করেছ!'

'কা করে! তিন চার সাল ধরে বুকের দোষ হয়েছে। তার সাথ সাথ হাঁপ আউর খাঁসি (কাশি)। তাতেই শরীরটা চৌপট হয়ে গেল।'

'ডাগদর দেখিয়ে দাওয়া খেয়েছ ?'

'পেটের দানা জোটে না তো ডাগদর, দাওয়া! আমাকে কী পেয়েছিস—রাজা মহারাজাকা ছৌয়া ?'

চাঁপিয়া আর কিছু বলে না।

গৈবীনাথ এতক্ষণ ভাল করে লক্ষ্য করেনি। এবার জেল্লাহীন ঘোলাটে চোখে একদৃষ্টে চাঁপিয়াকে দেখতে দেখতে বলে, 'তুইও চেহারার কী হাল করেছিস!'

চাঁপিয়া বড় করে শ্বাস ফেলে। বলে, 'চেচক (বসন্ত) হল যে। তারপরই হাল বুরা হয়ে গেল।'

'তুই আমি, দু'জনেই বুখারে কমজোরি হয়ে গেছি। ক্ষেতির কাম মিলবে কি না কে জানে।'

'ভগোয়ান কিষুণজীকা কিরপা—'

এই সময় মাটির খোরায় চা, গরম গরম সমোসা এবং পাঁউরুটি নিয়ে ফিরে আসে নাটোয়ার। রুটি-টুটি চাঁপিয়ার হাতে দিতে দিতে বলে, 'গরমাগরম খা লে। আমি আবার হাটিয়ায় যাচ্ছি।'

'কায় ?' নিজের অজান্তেই চাঁপিয়ার মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে আসে যেন।

'পাক্কী ধরে আসতে আসতে বললাম না, নয়া জগমগ-জগমগ কপড়া-উপড়া কিনে দেব। আমার মরদকা জবান—হাঁ।' বলে আর দাঁড়ায় না নাটোয়ার; ফের হাটের ভিড়ে মিশে যায়।

চায়ের ভাঁড়ে মুখ ঠেকাতে গিয়ে হঠাৎ চাঁপিয়ার চোখে পড়ে লুব্ধ দৃষ্টিতে খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে গৈবীনাথ আর সমানে ঢোক গিলছে। বোঝা যায় লোকটার পেটে এই মুহূর্তে মারাত্মক ভুখ। চাঁপিয়া শুধোয়, 'চায়-পানি খাবে ?'

গৈবীনাথ উত্তর দেয় না। তবে তার মুখচোখ দেখে মনে হয়, খাবার ষোল আনা ইচ্ছে।

ভাঁড়সুদ্ধ পুরো চা'টা দেবার মতো অতখানি মহানুভবতা চাঁপিয়ার

অন্তত নেই। আলগোছে অর্ধেকটা চা খেয়ে বাকি ভাঁড়টা গৈবীনাথকে দেয় সে। সেই সঙ্গে সমোসা, পাঁউরুটির ভাগও।

চায়ে ভিজিয়ে গোগ্রাসে পাঁউরুটি খেতে খেতে গৈবীনাথ শুধোয়, 'ওই আদমীটা কে?'

'কার কথা বলছ?' চাঁপিয়া জানতে চায়।

'যে চায়-পানি আউর রোটি উটি দিয়ে গেল।'

'ওর নাম নাটোয়ার দুসাদ।'

কৌতূহলী চোখে চাঁপিয়ার দিকে তাকিয়ে গৈবীনাথ এবার জিজ্ঞেস করে, 'নাটোয়ার তোকে চায়-রোটি খিলাচ্ছে কেন?'

চাঁপিয়া চুপ করে থাকে।

গৈবীনাথ এবার বলে, 'সমঝ গিয়া। কাম মিললে নাটোয়ার তোকে সাদি করে নিয়ে যাবে—নায়?'

চাঁপিয়া মুখ নামিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে।

গৈবীনাথ ফের বলে, 'আগে তো তোর ছে ছে'গো (ছ ছ'টা) সাদি হয়ে গেছে।'

চাঁপিয়া সম্পর্কে সব খবরই রাখে গৈবীনাথ। চাঁপিয়া বলে, 'হাঁ।'

ওদের কথাবার্তার মধ্যেই নাটোয়ার আবার ফিরে আসে। তার হাতে জগমগ-জগমগ নতুন শাড়ি। চাঁপিয়াকে সেটা দিতে দিতে বলে, 'কাছে রাখ। আমি তোর সপরনার (সাজগোজের) জিনিসগুলো নিয়ে আসি।' বলেই সে চলে যায়।

একসময় সামনের চালাগুলোর তলা থেকে ক্ষেতিমালিক এবং তাদের লোকজন উঠে এসে কিষাণ বাছতে শুরু করে। গৈয়াহাটা, ছাগরিহাটা কি মুরগিহাটায় যেভাবে গরুবাছুর ছাগল বা মুরগির গা টিপে টিপে পরখ করে নেওয়া হয় অবিকল সেই ভাবেই কড়াইয়া গাছগুলোর তলায় ঘুরে ঘুরে তারা ভূমিহীন ওঁরাও-মুণ্ডা এবং অচ্ছুৎদের যাচিয়ে বাজিয়ে নিচ্ছে। ক্ষেতি চষার মতো মারাত্মক খাটুনির কাজের তাকত যাদের আছে জমিমালিকেরা শুধু তাদেরই

বেছে নিচ্ছে। দুর্বল অশক্ত লোক নিয়ে কী লাভ ?

হট্টাকাট্টা চেহারার পুরুষ আর ঔরতেরা প্রথমেই কাজ পেয়ে যায়। ওদের নিয়ে কিছু কিছু জমিমালিক চলে যেতে থাকে। কড়াইয়া গাছগুলোর তলা ক্রমশ ফাঁকা হয়ে আসে।

ঝড়তি পড়তি পঞ্চাশ ষাটটা আদিবাসী আর অচ্ছুৎ ধোবী দোসাদের ভেতর চাঁপিয়া এখনও বসে আছে। তার পাশে গৈবীনাথ। লোকটা সমানে হাঁপিয়ে যাচ্ছে। জলহীন ফাঁকা হুঁকো টানার মতো অদ্ভুত একটা শব্দ একটানা কানে ঢুকতে থাকে চাঁপিয়ার।

অন্য সব বছর দেখামাত্রই জমিমালিকরা চাঁপিয়াকে পছন্দ করে ফেলত। কিন্তু এবার বরাত খারাপ। কিষাণ বাছাবাছি শুরু হবার পর কত ক্ষেতিমালিক তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এক পলক তাকে দেখেই চলে গেছে। গৈবীনাথেরও সেই একই হাল।

তবু আশা একেবারে ছেড়ে দেয়নি চাঁপিয়া। এখনও জনকয়েক ক্ষেতিমালিক রয়েছে। এই চাষের মরসুমে প্রচুর কিষাণ দরকার। নিশ্চয়ই কেউ না কেউ তাকে কাজ দেবে। মনে মনে অনবরত চাঁপিয়া বিড় বিড় করতে থাকে, 'হো কিষুণজী, হো রামজী তেরে কিরপা।'

জেঠ মাহিনার সূর্য এখন খাড়া মাথার ওপর উঠে এসেছে। চারদিকে ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ।

যে ক'জন জমিমালিক এখনও রয়েছে তারা কড়াইয়া গাছগুলোর তলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের মধ্যে যেই কেউ কাছে এসে দাঁড়ায়, বুকের ভেতর শ্বাস আটকে আসে চাঁপিয়ার। বেশির ভাগই কিছু না বলে সরে যায়। তবে এক আধজন জিজ্ঞেস করে, 'কা রে, ক্ষেতির কাজ পারবি ?'

রুদ্ধশ্বাসে চাঁপিয়া উত্তর দেয়, 'পারব হুজৌর।'

তীক্ষ্ণ চোখে জমিমালিক লক্ষ্য করতে থাকে। চাঁপিয়া সারা গায়ে শাড়ি জড়িয়ে জড়সড় হয়ে আছে। জমিমালিক বলে, 'কপড়া

হটা-—'

শাড়ি সরালে আসল চেহারা বেরিয়ে পড়বে। এমনিতেও যেটুকু আশা আছে, শরীরের হাল দেখলে কেউ তাকে পছন্দ করবে না। সে ভয়ে ভয়ে বলে, 'নায় নায় হুজৌর—'

জমিমালিক ভাবে, লজ্জায় ও সঙ্কোচে চাঁপিয়া গা থেকে কাপড় সরাতে চাইছে না। কুৎসিত একটা খিস্তি ঝেড়ে সে বলে, 'রাজা মহারাজের বিটিয়া সব—' বলেই এক টানে শাড়ির খানিকটা খুলে ফেলতেই চাঁপিয়ার দুর্বল রোগা শরীরের অনেকটা দেখতে পায়। বলে, 'ইসি লিয়ে কপড়া জড়িয়ে আছিস।' তারপর আঙুল দিয়ে চাঁপিয়ার হাত টিপতে টিপতে বলে, 'তোর গায়ে তো কিছু নেই রে। তোকে দিয়ে চলবে না।'

জমিমালিকের দু'পা জড়িয়ে ধরে চাঁপিয়া, 'চলবে হুজৌর। আমাকে কাম দিয়ে দেখুন—'

'হট্ হট্—'অকারণে বেশি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করে না জমিমালিক। এক ঝটকায় পা ছাড়িয়ে নিয়ে সে এগিয়ে যায়।

এবার গৈবীনাথ পাশ থেকে চেঁচিয়ে ওঠে, 'হামনিকো লে যা হুজৌর।

জমিমালিক থমকে দাঁড়িয়ে যায়। বলে, 'তোর সিনা (বুক) তো চুহার মতো। মুর্দাকে (মড়া) দিয়ে কি চাষের কাম হয় ? ভাগ শালে ভুচ্চর—'

গৈবীনাথ এবং চাঁপিয়া হাতেপায়ে ধরে হাজার কাকুতি মিনতি করেও একজন জমিমালিককেও টলাতে পারে না। বিশ পঁচিশ সাল ধরে সুরথপুরার হাটিয়ায় এই কড়াইয়া গাছগুলোর তলায় এসে বসছে দু'জনে। যত বার এসেছে তত বারই তাদের ক্ষেতির কাজে নেবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। শুধু এবারই বাদ।

সূর্য যখন পছিমা আকাশে হেলে পড়তে থাকে সেই সময় ঝড়তি পড়তিদের ভেতর থেকে আরো কিছু ঔরত এবং পুরুষ কিষাণ বেছে

নিয়ে বাকি জমিমালিকেরা চলে যায়। যে বিশ-পঁচিশটা আদিবাসী এবং অচ্ছুৎ চাঁপিয়াদের সঙ্গে বাতিল হয়ে গেছে তারাও একজন দু'জন করে চলে যায়। কড়াইয়া গাছগুলোর তলায় শুধু থাকে দু'জন—চাঁপিয়া আর গৈবীনাথ।

দুই হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে এখন চুপচাপ বসে আছে চাঁপিয়া। তার পাশে শ্বাসটানা অদ্ভুত শব্দ করে কেঁদে চলেছে গৈবীনাথ, 'কাম নায় মিলল। মর যায়েগা, জরুর মর যায়েগা—' একদিন যার শরীর ছিল লোহা বা পাথর কেটে তৈরি, সে যে এভাবে কাঁদতে পারে, তা যেন ভাবা যায় না। তার কান্নার আওয়াজ জ্যৈষ্ঠের তাতানো বাতাসে ঘন বিষাদ ছড়াতে থাকে।

ঠিক এই সময় সপরনার জিনিসপত্র কিনে ফিরে আসে নাটোয়ার। কড়াইয়া গাছগুলোর তলায় ফাঁকা জায়গাটায় ঘাড় গুঁজে চুপচাপ চাঁপিয়াকে বসে থাকতে দেখে চোখের পলকে কিছু একটা আঁচ করে নেয়। গৈবীনাথ সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। আস্তে করে নাটোয়ার ডাকে, 'চাঁপিয়া—'

চাঁপিয়াও কাঁদছিল; তবে শব্দ করে নয়। নাটোয়ারের গলা কানে আসতেই তার হৃদ্‌পিণ্ড থমকে যায়। মুখ তুলে আরক্ত চোখে ভয়ে ভয়ে নাটোয়ারের দিকে তাকায়।

নাটোয়ার সরাসরি কাজের কথায় আসে, 'ক্ষেতিকা কাম মিলল?'

'নায়—' বিষণ্নভাবে মাথা নাড়ে চাঁপিয়া।

'এতগুলো ক্ষেতিমালিক এসেছিল; কেউ তোকে পসন্দ্‌ করল না?'

'নায়—'

নাটোয়ারকে দেখে কান্না থামিয়ে দিয়েছিল গৈবীনাথ। কড়াইয়া গাছগুলোর তলায় এই নির্জন দুপুরে গভীর স্তব্ধতা নেমে আসে কিছুক্ষণের জন্য।

একসময় ঠাণ্ডা গলায় নাটোয়ার শুরু করে, 'কাম মিলল না। তা হলে সাদিটা হয় কী করে?'

চাঁপিয়া চুপ।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নাটোয়ার। তারপর ফের বলে, 'শাড়িটা দে—'

নিঃশব্দে কাঁপা হাতে নতুন কাপড়টা পাশ থেকে তুলে নাটোয়ারের দিকে বাড়িয়ে দেয় চাঁপিয়া। একরকম ছোঁ মেরেই সেটা নিয়ে হাটের দিকে চলে যায় নাটোয়ার।

এতক্ষণ বুকের ভেতর দম বন্ধ করে বসে ছিল গৈবীনাথ। এবার বড় করে শ্বাস টানে সে; খানিক হাঁপিয়ে গাঢ় দুঃখের গলায় বলে, 'তোর এই সাদিটা বরবাদ হয়ে গেল।'

চাঁপিয়া কিছু বলে না। বলার কী-ই বা থাকতে পারে এই অবস্থায়।

গৈবীনাথ বলতেই থাকে, 'এখন কী করবি? কাম তো জুটল না। রওদ আগ য্যায়সা (আগুনের মতো); গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে।'

সাদি না হওয়া এবং কাজ না পাওয়ার ধাক্কা কিছুটা কাটিয়ে ওঠে চাঁপিয়া। তার মনে হয়, এটাই তো একান্ত স্বাভাবিক। এবার সে মুখ খোলে, 'এখানে বসে থেকে কা ফায়দা? ঘরে লৌটব।'

'মনপথল?'

'হাঁ।'

'সুরথপুরায় এসে এই পয়লা সাদি না করে তুই বাপের ঘরে লৌটছিস—নায়?'

কথাটা বলার জন্যই বলেছে গৈবীনাথ। উত্তর না দিয়ে চাঁপিয়া বলে, 'তুমি এখন কী করবে?'

'ভাবছি।' সাঁই সাঁই শব্দ করে শ্বাস টানতে থাকে গৈবীনাথ, 'আমার যাবার কোনো জায়গা নেই।'

'কেন, তোমার গাঁওকা ঘর?'

'দো সাল আগে ওটা মহাজনের পেটে ঢুকে গেছে।'

'ক্যায়সে?'

'ভারী বীমার (রোগ) হল। কাম বন্ধ, মগর পেটটা তো চালু

রাখতে হবে। তাই করজ নিয়েছিলাম। রুপাইয়া ওয়াপস করতে পারলাম না ; বাপ-নানার ঘরটা চলে গেল।'

'তা হলে তুমি থাকো কোথায় ?'

'ইহা-উঁহা। হাটিয়ার চালির তলায়, পেঁড়কা নীচামে, সড়ককা বগলমে। বুকের দোষ হয়েছে, গলা দিয়ে খুন নিকলেছিল, কোনো মানুষ আমাকে কাছে ভিড়তে দেয় না।'

হঠাৎ বাতিল, বীমারী রুগ্ন দুর্বল মানুষটা সম্বন্ধে অপার সহানুভূতি বোধ করতে থাকে চাঁপিয়া। গৈবীনাথের মতো সে-ও তো পৃথিবী থেকে খারিজ হয়ে গেছে। চাঁপিয়া বলে, 'তোমার তা হলে কোথাও যাবার জায়গা নেই ?'

'নায়—' ঘাড় হেলায় গৈবীনাথ।

'হামনিকো সাথ মনপথল চল।'

গৈবীনাথ চমকে ওঠে, 'কী বলছিস ! তোর মাথাটা খারাপ হয়ে গেল !'

চাঁপিয়া বলে, 'ঠিকই বলছি। মাথা আমার ঠিকই আছে।'

'তুই একা থাকিস। আমাকে নিয়ে তুললে গাঁওবালারা কী বলবে হুঁশ আছে ?'

এ দিকটা খেয়াল করেনি চাঁপিয়া। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে সে। মনে মনে ভাবে, এতকাল নিজের নিরাপত্তা ছাড়া আর কোনো চিন্তাই তার মাথায় ঢুকত না। এ জন্য একের পর এক পুরুষের পিছু পিছু সুরথপুরার হাটে এসেছে। কিন্তু তার চাইতেও দুর্বল, তার চাইতেও কমজোরী অসহায় বীমারী আদমীও রয়েছে। লক্ষকোটি মানুষের পৃথিবীতে গৈবীনাথকেই একমাত্র তার বড় আপন মনে হয়। চাঁপিয়া মনঃস্থির করে ফেলে। বলে, 'মনপথলে যাবার আগে, বামহনের কাছে গিয়ে সাদিটা চুকিয়ে ফেলব। চাঁদির পৈড়ি বেচে বামহনের পাইসা দেব।'

ফুসফুস ফাটিয়ে চিৎকার করে ওঠে গৈবীনাথ, 'নায় নায়, এ নহি হোগা—'

চাঁপিয়া বলে, 'তুমনি চুপ হো যাও। রামজী কসম—'

সন্ধের পর মনপথলের দোসাদরা, গঞ্জুরা, ধোবীরা চমকে উঠে দেখতে পায় চাঁপিয়া দুসাদিন ভোরে সেজেগুজে একজনের সঙ্গে চলে গিয়েছিল, কিন্তু ফিরে এল আরেক জনের সঙ্গে।

এতদিন ছ ছ'টা পুরুষ চাঁপিয়াকে সাদি করে নিয়ে গেছে। কিন্তু জীবনে এই প্রথম সে স্বয়ম্বরা হল।

একসময় সবার অবাক চোখের সামনে দিয়ে দু'টি বাতিল মানুষ মনপথলের শেষ মাথায় বহুকালের প্রাচীন একটা কোমর-বাঁকা ধসে-পড়া ঘরে গিয়ে ওঠে।

[বিভাব]

মানুষ

ঠিক দুপুরবেলা শেরমুণ্ডি পাহাড়ের কাছাকাছি আসতেই হুড়মুড় করে বৃষ্টিটা নেমে গেল।

সেই ভোরে—আকাশ তখনও ঝাপসা, রোদ ওঠেনি, বাঁশের লাঠির ডগায় রং-বেরঙের তালিমারা ঝুলিটা বেঁধে এবং ঝুলিসুদ্ধ লাঠিটা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে পড়েছিল ভরোসালাল। সে আসছে রাজপুত ঠাকুর রঘুনাথ সিং-এর তালুক হেকমপুর থেকে ; আপাততঃ যাবে শেরমুণ্ডি পাহাড়ের ওপারে টাউন ভকিলগঞ্জে।

ভোরে ভরোসালাল যখন হেকমপুর থেকে বেরোয় তখন আকাশের চেহারা দেখে টের পাওয়া যায়নি দুপুরের মধ্যেই চারদিক ভেঙেচুরে এভাবে বৃষ্টি নেমে যাবে। খুব নিরীহ চেহারার দু-চার টুকরো ভবঘুরে মেঘ মাথার ওপর বাতাসের ধাক্কায় ধাক্কায় এদিক সেদিক ভেসে বেড়াচ্ছিল। তারপর বেলা একটু বাড়লে চাঁদির থালার মতো সূর্যটা আকাশের গড়ানে গা বেয়ে উঠে এসেছিল। গলানো রুপোর মতো ঝকঝকে রোদে মাঠ-ঘাট বন-জঙ্গল ভেসে যাচ্ছিল তখন। কিন্তু এই রোদ আর কতক্ষণ! বেলা আরেকটু চড়বার সঙ্গে সঙ্গে এক ফুঁয়ে বাতি নিভে যাবার মতো আচমকা চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছিল। মকাইয়ের ক্ষেত, যবের ক্ষেত, আখের ক্ষেত, নানারকম ঝোপঝাড় আর হতচ্ছাড়া চেহারার দু-একটা গ্রাম পেরিয়ে আসতে আসতে ভরোসালালের অজান্তে কখন যে ভারী ভারী চাংড়া চাংড়া জলবাহী

মেঘে আকাশ ছেয়ে গিয়েছিল, টের পাওয়া যায়নি। ভরোসালাল চমকে উঠেছিল মেঘের ডাকে; সেই সঙ্গে তার চোখে পড়েছিল আকাশটা আড়াআড়ি চিরে বিদ্যুৎ ছুটে যাচ্ছে।

মাথার ওপর মেঘ আর বিদ্যুৎচমক নিয়ে জোরে জোরে পা চালিয়ে দিয়েছিল ভরোসালাল। আজ যেমন করেই হোক তাকে শেরমুণ্ডি পাহাড়ের ওপারে ভকিলগঞ্জে পেঁছুতেই হবে।

হাঁটতে হাঁটতে ঘাড় ফিরিয়ে বার বার পেছন দিকটা দেখে নিচ্ছিল ভরোসালাল। হঠাৎ একসময় অনেক, অনেক দূরে আকাশ যেখানে পিঠ বাঁকিয়ে দিগন্তে নেমেছে সেখানটায় বৃষ্টি নেমে গিয়েছিল। জল নামতে দেখে দৌড়ুতেই শুরু করেছিল ভরোসালাল, কিন্তু বৃষ্টিটা নাছোড়বান্দা হয়ে তার পিছু নিয়েছে; শেষ পর্যন্ত শেরমুণ্ডি পাহাড়ের তলায় এসে তাকে ধরেই ফেলেছে।

বেশ কোমর বেঁধেই নেমেছে বৃষ্টিটা। তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে উল্টোপাল্টা ঝড়ো হাওয়া। এই ঝড়বৃষ্টি ঘাড়ে নিয়ে সামনের খাড়া পাহাড়ে যাওয়া সম্ভব না। ভরোসালাল এদিক-সেদিক তাকাতে লাগল। এই মুহূর্তে মাথা বাঁচাবার জন্য কোথাও একটু দাঁড়ানো দরকার। হঠাৎ সে দেখতে পেল খানিকটা দূরে একটা ঝাঁকড়া-মাথা পিপুল গাছের তলায় দশ-বারোটা দেহাতী লোক দাঁড়িয়ে আছে; তাদের মধ্যে একটা মেয়েও রয়েছে।

বোঝা যাচ্ছে, বৃষ্টির জন্যই ওরা ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। গাছ-তলায় মাথা গুঁজে জলের ছাঁট থেকে নিজেদের যতটা বাঁচানো যায়। ভরোসালাল দৌড়ে সেখানে চলে গেল।

ভরোসালালের বয়স পঞ্চাশ বাহান্ন। শরীরের কাঠামো দারুণ মজবুত। চওড়া ছড়ানো কাঁধ তার, এবড়ো-খেবড়ো পাথরের মতো প্রকাণ্ড বুক, হাতদুটো জানু ছাড়িয়ে কয়েক আঙুল নেমে গেছে। গায়ের চামড়া পোড়া ঝামার মতো, সাত জন্মে সেখানে তেল পড়ে না। ফলে বারোমাস খসখসে কর্কশ গা থেকে খই উড়তে থাকে।

চৌকো মুখে খাপচা খাপচা দাড়ি তার, থ্যাবড়া থুতনি। চেহারা যেমনই হোক, চোখ দুটো কিন্তু আশ্চর্য মায়াবী—যেমনি সরল তেমনি নিষ্পাপ।

ভরোসালালের পরনে হাঁটু পর্যন্ত খাটো টেনি আর ফতুয়ার মতো লাল কামিজ। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তার ঘাড়ের কাছে অনেকখানি মাংস শুকিয়ে ডেলা পাকিয়ে ঝুলে আছে। বাঘের থাবা খেয়ে ঘাড়টার অবস্থা এই রকম।

ভরোসালাল একজন 'বীটার'। এ অঞ্চলে যাকে জঙ্গল-হাঁকেয়া বলে সে তা-ই। তার কাজ হলো বনে-জঙ্গলে টিন পিটিয়ে আর চেঁচিয়ে তাড়া করে করে বাঘ ভাল্লুক কিংবা অন্য জন্তু-জানোয়ারকে বন্দুকের মুখে নিয়ে যাওয়া। বছর তিনেক আগে রক্সৌলে এক শিকারীর জন্য টিন পেটাতে গিয়ে বাঘের থাবায় ঘাড়ের মাংস ওইভাবে ঝুলে গেছে। 'বীটারে'র কাজ ছাড়া আরো একটা কাজ করে থাকে ভরোসালাল। চারদিকে যত ছোটখাটো শহর আছে, সে সব জায়গায় মিউনিসিপ্যালিটিগুলো মাঝে মাঝে রাস্তার বেওয়ারিশ ক্ষ্যাপা কুকুর ধরে মেরে ফেলে। এই কুকুর ধরা আর মারার কাজটি করে থাকে সে।

'বীটারে'র কাজ কিংবা কুকুর মারার দায়িত্ব কেউ তাকে ডেকে দেয় না। ভরোসালাল নিজে থেকেই খোঁজ খবর নিয়ে শিকারীদের বাড়ি বাড়ি কিংবা মিউনিসিপ্যালিটিগুলোর দরজায় দরজায় হানা দেয়। এটাই তার জীবিকা। খুবই নিষ্ঠুর হয়তো। কিন্তু স্রেফ পেটের জন্য এসব করতে হয় তাকে।

এদিকে বৃষ্টির জোর আরো বেড়েছে। আকাশের যা অবস্থা তাতে জল কখন ধরবে তার ঠিক ঠিকানা নেই। ঝাঁকড়া-মাথা পিপুল গাছের তলায় দেহাতী মানুষগুলোর সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেষি করে দাঁড়িয়েও কি রেহাই আছে। ডালপালা আর পাতার ফাঁক দিয়ে ঝর ঝর জল পড়ে গা-মাথা ভিজিয়ে দিচ্ছে। তবে খোলা জায়গায়

দাঁড়ালে চোখের পলকে নাহানা (স্নান) হয়ে যাবে। সেই তুলনায় এখানে ভেজাটা কম হচ্ছে, এই আর কি।

অন্যমনস্কের মতো তাকিয়ে তাকিয়ে বৃষ্টির ভাবগতিক দেখছিল ভরোসালাল। হঠাৎ পাশের লোকটা বলে উঠল, 'বহোত ভারী বারিষ (বৃষ্টি)।'

ভরোসালাল ঘাড় ফেরাল। দেখল—লোকটা মধ্যবয়সী, মাথায় পাগড়ী, ভাঙাচোরা চেহারা। সে বলল, 'হাঁ—'

লোকটা এবার বলল, 'মালুম হচ্ছে এ বারিষ জলদি রুখবে না।' তার ভাষা হিন্দী এবং বাংলায় মেশানো। খুব সম্ভব বিহার-বাংলার সীমান্তে কোনো অঞ্চলে তার বাড়ি।

ভরোসালাল বলল, 'হাঁ—'

মধ্যবয়সী লোকটা এবার তার সঙ্গীদের দেখিয়ে বলল, 'তুফারে (তুপুরে) হামলোগকো টেউন ভুকিলগঞ্জে যাবার কথা ছিল। লেকিন কি করে যাই?'

বোঝা যাচ্ছে এরাও শেরমুণ্ডি পাহাড় পেরিয়ে ওপারে যাবে। ভরোসালাল কৌতূহলহীন চোখে লোকটার সঙ্গীগুলোকে একবার দেখে নিল। তারা অবশ্য এই লোকটার মতো মাঝবয়সী না, দামড়া মোষের মতো তারা একেকটা তাগড়া জোয়ান। তাদের দেখতে দেখতে সেই মেয়েটার দিকে নজর পড়ে গেল ভরোসালালের। দলটার মধ্যে সে একা—একমাত্র আওরত।

জীবন বা মানুষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা খুবই কম ভরোসালালের। জোয়ান বয়সের শুরু থেকে বনের হিংস্র জন্তু-জানোয়ার আর ক্ষ্যাপা কুকুরের পেছনে ছুটে ছুটে এতগুলো বছর কেটে গেছে তার। তবু সে বুঝতে পারল মেয়েটা গর্ভিণী। দু-চার দিনের মধ্যে তার বাচ্চাটাচ্চা হবে।

পাশের লোকটা প্রচণ্ড বক বক করতে পারে। এবার সে যা বলল, সংক্ষেপে এইরকম। বৃষ্টিতে ভিজে পাহাড়ী রাস্তার হাল খুবই

বুরা (খারাপ) হয়ে গেছে। এখন সেখানে উঠতে যাওয়া বোকামি ; পা পিছলে পড়ে গেলে আর দেখতে হবে না—নির্ঘাত খতম হয়ে যেতে হবে।

মেয়েটার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ভরোসালাল বলল, 'হাঁ—'

লোকটা এবার বলল, 'লেকিন তুফারের ভেতর ভুকিলগঞ্জে হাজির হতে না পারলে কামটা ছুটে যেতে পারে।' তাকে খুবই চিন্তিত দেখাল।

'কিসের কাম ?'

'ভুকিলগঞ্জে নদীর কিনারে বাঁধ বানানো হবে। আমরা মাটি কাটার কামে যাচ্ছি। দেরি হয়ে গেলে গরমিন অফসর (গভর্ণমেণ্ট অফিসার) যদি ভাগিয়ে দেয়—'

'রামজী বিরপা করলে ভাগাবে না।' বলতে বলতে আবার মেয়েটার দিকে তাকাল ভরোসালাল। পৃথিবীর কোনো কিছু সম্বন্ধেই বিশেষ আগ্রহ নেই তার। নিজের পেটের জন্য বনে-জঙ্গলে বা লোকালয়ে সর্বক্ষণ তাকে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে অন্য দিকে চোখ তুলে তাকাবার সময় পর্যন্ত পায় না। যদিও বা পায়, খুবই কৌতূহল-শূন্যভাবে এই পৃথিবী আর পৃথিবীর মানুষকে দেখে থাকে সে। তবু আবছাভাবে ভরোসালাল ভাবল, ওই মেয়েটির পেটে ন-দশ মাসের বাচ্চা রয়েছে। এ অবস্থায় সে-ও কি মাটি কাটতে চলেছে ! জেনানাদের এ সময়টা কোন ভারী কাজ করা ঠিক না। ভাবল বটে, তবে কিছু বলল না।

সেই লোকটা ঘাড়ের পাশ থেকে বলে উঠল, 'রামজী কি কিরপা করবে ?'

ভরোসালাল এবার আর উত্তর দিল না। অন্যমনস্কের মতো মুখ ফিরিয়ে মেঘের ভারে নেমে আসা ঝাপসা আকাশ দেখতে লাগল।

কিন্তু উত্তর না দিলে কী হবে, পাশের লোকটা ঘ্যানঘেনে বৃষ্টির মতো সমানে বকে যেতে লাগল।

কতক্ষণ পিপুল গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে ছিল, খেয়াল নেই ভরোসা-লালের। হঠাৎ একসময় বৃষ্টির তোড় কমে এল; সেই সঙ্গে ঝড়ের দাপটও। তবে আকাশ ভারী হয়ে আছে। যে কোনো মুহূর্তে প্রবল বেগে আবার শুরু হয়ে যেতে পারে।

সেই লোকটা কানের পাশ থেকে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'বারিষ ধরে এসেছে। এই মওকায় পাহাড় পেরুতে হবে।' বলেই সঙ্গীদের উদ্দেশে জোরে জোরে হাঁকল, 'অ্যাই ছোকরারা—চল চল, জোরসে পা চালা—' সবাইকে তাড়িয়ে নিয়ে সে পাহাড়ের দিকে চলল।

দলটা আগে আগে চলেছে। তাদের পেছনে রয়েছে সেই মেয়েটা। ভরোসালাল এই সুযোগটা ছাড়ল না। মেয়েটার পেছন পেছন সে-ও হাঁটতে লাগল। বৃষ্টির জোর নতুন করে বাড়বার আগেই সে-ও শেরমুণ্ডি পাহাড় পেরিয়ে যেতে চায়।

দিনকয়েক আগে, ঠাকুর রঘুনাথ সিং শিকারে যাবেন—এই খবরটা পেয়ে হেকমপুর তালুকে ছুটে গিয়েছিল ভরোসালাল। পুরো চারটে দিন রঘুনাথ সিংয়ের সঙ্গে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে টিন পিটিয়ে, মোট দশটা টাকা আর তিন কিলো মকাই মজুরি হিসেবে পেয়েছে। সেই টাকাটা তার কোমরে গোঁজা রয়েছে, আর মকাইগুলো আছে চিত্রবিচিত্র ঝুলিটায়।

হেকমপুরে থাকতে থাকতেই সে খবর পেয়েছিল, পূর্ণিয়া টাউনে দু-চার দিনের মধ্যে ক্ষ্যাপা কুকুর মারা হবে। তাই রঘুনাথ সিংয়ের শিকার শেষ হতে না হতেই সে বেরিয়ে পড়েছে। শেরমুণ্ডি পাহাড় ডিঙিয়ে ওপারে টাউন ভকিলগঞ্জে আজকের রাতটা কাটাবে ভরোসালাল। তারপর কাল সকালে উঠে চলে যাবে সগরিগলি ঘাটে; সেখানে নদী পেরিয়ে পূর্ণিয়া টাউনের দিকে হাঁটা শুরু করবে।

যাই হোক, এই শেরমুণ্ডি পাহাড়টা ভয়ানক রকমের খাড়া। তার সারা গায়ে ঘন অরণ্য। শাল আর মহুয়ার গাছই এখানে বেশি করে

চোখে পড়ে। অবশ্য আমলকী, দেবদারু, কেঁদ, পিপর আর ট্যারাবাঁকা চেহারার অগুনতি সিসম গাছও চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। এ ছাড়া আছে নানা ধরনের ঝোপঝাড়, সাবুই ঘাস এবং আগাছার জঙ্গল।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা পায়ে চলার রাস্তা উঠে গেছে। সেই রাস্তা এই মুহূর্তে অত্যন্ত বিপজ্জনক। যদিও এটা একটা পাহাড় তবু হাজার হাজার বছরের ঝড়বৃষ্টিতে পাথর ক্ষয়ে ক্ষয়ে এর গায়ে চামড়ার মতো মাটির একটা স্তর জমেছে। বৃষ্টিতে সেই মাটি গলা মাংসের মতো থকথকে হয়ে আছে।

খুব সাবধানে পা ফেলে ফেলে ওরা পাহাড় বাইছিল। বৃষ্টির জোর কমে এলেও অল্প অল্প পড়েই যাচ্ছে। হাওয়ার দাপটও আগের মতো নেই। দু-ধারের ঝোপঝাড় থেকে ঝিঁঝিদের একটানা চিৎকার উঠে আসছিল। গাছের মাথায় সরু-মোটা নানা বিচিত্র সুরে পাখিরা একটানা ডেকে যাচ্ছে। কোথায় যেন সাপেদের পেট টেনে টেনে চলার শব্দ হচ্ছে।

সেই মধ্যবয়সী লোকটা মাঝে মাঝেই তার সঙ্গীদের উদ্দেশে হেঁকে উঠছিল, 'জলদি পা চালা। হো রামজী, তুফার পার হয়ে গেল!'

চারদিকের নানারকম শব্দ বা মধ্যবয়সী লোকটার হাঁকাহাঁকি শুনেও যেন শুনতে পাচ্ছিল না ভরোসালাল। দূরমনস্কর মতো খাড়াই পাহাড় ভাঙছিল সে। নেহাত বৃষ্টিটা হঠাৎ এসে গেছে। নইলে তাড়াহুড়ো করে ওপারে যাবার খুব একটা দরকার তার নেই। কারণ আজকের দিনটা তার বিশ্রাম। টাউন ভকিলগঞ্জে একবার পৌঁছুতে পারলে ধীরেসুস্থে হাত-পা ছড়িয়ে দিনের বাকি অংশটা সে কাটিয়ে দেবে। তারপর কাল থেকে আবার নতুন কাজের ধান্দা শুরু হবে। কিন্তু কালকের কথা কাল।

খানিকক্ষণ পাহাড় বাওয়ার 'পর হঠাৎ কাতর গোঙানির মতো একটা আওয়াজ কানে আসতে চমকে উঠল ভরোসালাল। সামনের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল সেই গর্ভিণী মেয়েটা পাহাড়ে ওঠার

ক্লান্তিতে ভয়ানক হাঁপাচ্ছে। তার মুখটা অনেকখানি হাঁ হয়ে গেছে। তার ফাঁক দিয়ে থেকে থেকে গোঙানিটা বেরিয়ে আসছিল। হাঁপানির দাপটে মেয়েটার বুক তোলপাড় হয়ে যাচ্ছিল। চোখের তারাদুটো মরা মাছের চোখের মতো; মনে হচ্ছিল সে দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।

প্রায় টলছিল মেয়েটা। তাব মধ্যেই হাতখানেক গভীর থকথকে কাদার ভেতব এলোপাথাড়ি পা ফেলতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু পারছিল না। সে হয়ত ঘাড়মুখ গুঁজে হুড়মুড় করে পড়েই যেত, তার আগে পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল ভরোসালাল। বলল, 'কা, তুমহাবা তবিয়ত আচ্ছা নহী—'

খুব নির্জীব গলায় মেয়েটা উত্তর দিল, 'নহী—'

ভরোসালাল কি বলতে যাচ্ছিল; হঠাৎ তার চোখে পড়ল সেই মাঝবয়সী লোকটা দামড়া মোষের মতো জোয়ান ছোকরাগুলোকে নিয়ে ঝোপঝাড় ঠেলে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। সে এবার অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'আরে, তোমার সাঁথবালারা (সঙ্গীরা) বহোত দূর চলে গেল যে!'

মেয়েটা বলল, 'আমি ওদের সাথ আসিনি।'

ভয়ানক চমকে উঠল ভরোসালাল, 'মতলব (মানে)?'

'আমি একেলীই এসেছি।'

'হো রামজী, শরীরের এই হাল নিয়ে তুমি একেলীই বেরিয়ে পড়েছ!'

'কী করব?'

'কেন, তোমার মরদ কোথায়?'

মেয়েটা ভরোসালালের প্রকাণ্ড চওড়া বুকের ওপর শরীরের ভার রেখে খানিকটা সামলে নিয়েছিল। এবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'সে আসতে পারল না।'

ভরোসালাল জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'মহাজনের ক্ষেতিবাড়িতে সে বেগার দিতে গেছে।'

'বেগার ?'

'হাঁ—' মেয়েটা এবার যা বলল তা এইরকম। চার সাল আগে তাদের দেহাতের মহাজন বিষুণ আহীরের কাছ থেকে কিছু টাকা 'করজ' নিয়েছিল তার মরদ। টাকাটা আর শোধ করা যায়নি। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা লোকটার; তার সিন্দুকে সোনাচাঁদি আর জহরতের পাহাড়। আর জমিজমা ক্ষেতিবাড়ির তো লেখাজোখা নেই। তাদের দেহাতে যেখানে যে জমিতে পা দেওয়া যাক না, সেটাই বিষুণ আহীরের। এত জমি, এত টাকা-পয়সা থাকলে কি হবে, লোকটা আস্ত কসাই, আস্ত গিধ। এই মেয়েটার মরদের সামান্য ক'টা টাকা উশুল করার জন্য বিষুণ তাকে বছরের পর বছর বেগার খাটিয়ে চলেছে। বছরে ছু মাস মেয়েটার মরদকে বিষুণ আহীরের ক্ষেতিবাড়িতে বেগার দিতে হয়। সুদে-আসলে বিষুণের টাকাটা ফুলেফেঁপে এমনই হয়ে দাঁড়িয়েছে যাতে দশ বছর বেগার দিলেও নাকি ওটা শোধ হবে না। এইরকম যখন অবস্থা তখন মেয়েটির মরদ তার সঙ্গে আসে কী করে!

সব শুনে ভরোসালাল এবার জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ঘরে মরদ ছাড়া আর কোঈ (কেউ) নেই ?'

'নহী।'

'হো রামজী—' বলে একটু চুপ করল ভরোসালাল। পরক্ষণে আবার শুরু করল, 'এবার তুমি নিজে নিজে চলতে পারবে ?'

মেয়েটা বলল, 'পারব।'

'বহোত হুঁশিয়ার হয়ে পা ফেলে চল—'

খুব সাবধানে চটচটে আঠালো কাদার ভেতর পা টেনে টেনে ছু'জনে এগুতে লাগল।

সেই মধ্যবয়সী লোকটা তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে শাল এবং সিসম গাছটাছের ভেতর উধাও হয়ে গেছে। এখন আর তাদের দেখা যাচ্ছে

না। ইচ্ছা করলে লম্বা লম্বা পা ফেলে ভরোসালাল পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে অনেক উঁচুতে উঠে যেতে পারে। কিন্তু মেয়েটাকে এ অবস্থায় ফেলে তার পক্ষে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ার, ক্ষ্যাপা বুবুর আর নিজের পেট ছাড়া পৃথিবীর কোন ব্যাপারেই ভরোসালালের আগ্রহ নেই। তবু মেয়েটার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে তার অল্পস্বল্প কৌতুহল হতে লাগল। সে বলল, 'তোমার গাঁও কোথায় ?'

মেয়েটি বলল, 'পাঁচ মিল (মাইল) পছিমে ; নাম ঝুমরি -তালিয়া—'

'গাঁও থেকেই এখন আসছ ?'

'হাঁ—'

'পাহাড়ের ওপারে কোথায় যাবে ?'

'টেউন ভুকিলগঞ্জে—'

'কোন রিস্তার (আত্মীয়) বাড়ি ?'

'নহী।'

'তব্ (তবে) ?'

একটু চুপ করে থেকে মেয়েটা বলল, 'আমি অসপাতাল (হাসপাতাল) যাচ্ছি।'

'অসপাতাল কেন ?' বলেই ভরোসালালের মনে পড়ল মেয়েটা গর্ভিণী। নিশ্চয়ই বাচ্চাটাচ্চা হবার ব্যাপারে হাসপাতালে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে আবার বলে উঠল, 'সমঝ গিয়া ; রামজীকা কিরপা—'

মেয়েটা মুখ নিচু করে হাঁটতে লাগল।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ।

এই শেরমুণ্ডি পাহাড়ের গায়ে নির্দিষ্ট কোনো রাস্তা নেই। ঝোপ-ঝাড় এবং জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ফাঁকা জায়গা দেখে দেখে খাড়াই বেয়ে ওপরে উঠতে হচ্ছে।

একসময় মেয়েটি জড়ানো গলায় হঠাৎ ডেকে উঠল, 'এ আদমী—'

ভরোসালাল ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, 'কিছু বলবে ?'

'হাঁ। একগো বাত—'

'বল – '

তক্ষুনি কিছু বলল না মেয়েটা। খানিকক্ষণ বাদে প্রায় মরিয়া হয়েই শুরু করল, 'আমি একেলী আওরত (স্ত্রীলোক), তবিয়তের হালও খুব খারাপ। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পাহাড় বাইতে ডর লাগছে। তুমি আমাকে ফেলে রেখে চলে যেও না।'

ভরোসালাল ভালো করে মেয়েটাকে লক্ষ্য করল। তার দুর্বল রক্তহীন শরীর, গর্তে বসে-যাওয়া চোখ, চোখের কোলের গাঢ় কালি, পেরেকের মাথার মতো ঠেলে-ওঠা কণ্ঠার হাড়, মাংস ঝরে যাওয়া লম্বাটে রোগা মুখ, শির বার-করা সিকড়ে সিকড়ে হাত, ন-দশ মাসের বাচ্চাওলা স্ফীত পেট, বোতামহীন জামার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা টসটসে স্তন. স্তনের বোঁটার চারপাশে ভুসো কালির ছোপ, ইত্যাদি দেখতে দেখতে কেমন যেন মমতা বোধ করতে লাগল সে। বলল, 'আরে না-না, তোমাকে একলা ফেলে আমি যাচ্ছি না। টেউন ভুকিলগঞ্জে আমিও যাচ্ছি। আমার সাথ সাথ তুমি সেই পর্যন্ত যেতে পারবে।'

মেয়েটার মুখচোখ দেখে মনে হল, একটা শক্তসমর্থ সবল পুরুষের ভরসা পেয়ে সে যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে।

পাঁক ঠেলে ঠেলে দু'জনে চলেছে তো চলেছেই। আরো খানিকক্ষণ যাবার পর হঠাৎ ভরোসালাল লক্ষ্য করল, মেয়েটার পা ঠিকমতো পড়ছে না ; আবার সে টলতে শুরু করেছে। জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে তার। এবারও তাকে ধরে ফেলল ভরোসালাল। জিজ্ঞেস করল, 'কী হল ?'

মেয়েটা কাঁপা দুর্বল গলায় বলল, 'মাথা ঘুরছে।'

'হাঁটতে তকলিফ হচ্ছে ?'

'হাঁ।'

'থোড়েসে জিরিয়ে নাও—'

ওখানেই একটা পাথর দেখে বসে পড়ল মেয়েটা। কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে উঠতে উঠতে বলল, 'চল—' কিন্তু পা ফেলতে গিয়ে আবার টলতে শুরু করল।

ভরোসালাল চিন্তিতভাবে বলল, 'মালুম হচ্ছে তুমি হেঁটে যেতে পারবে না। পা ফেলতে গেলেই টলছ, মাথায় চক্কর লাগছে। এক কাম করা যাক—'

মেয়েটা নির্জীব গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

'তোমাকে আমি ধরে নিয়ে যাই। তোমার যা হাল, একেলী চলতে গেলে পড়ে গিয়ে বিপদ হয়ে যাবে।'

মেয়েটা আস্তে মাথা হেলাল। অর্থাৎ ভরোসালাল ধরে নিয়ে গেলে তার আপত্তি নেই। তা হলে সে বেঁচেই যায়।

ভরোসালাল মেয়েটিকে ধরে ফেলল। এক হাতে তার কাঁধ বেড় দিয়ে আস্তে আস্তে আবার ওপরে উঠতে লাগল। খানিকটা যাবার পর সে টের পেল মেয়েটার হাঁটার শক্তি ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে। আর যত ফুরিয়ে আসছে ততই তার শরীরের সব ভার ভরোসালালের হাতের ওপর এসে পড়ছে। কাদাভর্তি পিছল পথে বাচ্চাসমেত একটি গর্ভিণী মেয়ের গোটা দেহের ওজন একটা হাতের ওপর নিয়ে এগুনো সম্ভব না। ভরোসালাল মেয়েটাকে প্রায় সাপ্টে বুকের ভেতর নিয়ে এল। সেই অবস্থাতেই তাকে নিজের সঙ্গে লেপ্টে নিয়ে পাহাড় ভাঙতে লাগল। আর সমানে বিড় বিড় করতে লাগল, 'হো রামজী, হো রামজী—তেরে কিরপা, তেরে কিরপা—'

এতক্ষণ বৃষ্টির জোর ছিল না; তবে মিহি চিনির দানার মতো সেটা পড়েই যাচ্ছিল। হঠাৎ আবার তোড়ে এল বৃষ্টিটা। হাওয়া পড়ে গিয়েছিল। সেটাও বৃষ্টির মতই আচমকা উন্মাদ হয়ে পাহাড়ী জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সাঁই সাঁই ঘোড়া ছোটাতে শুরু করে দিল।

এদিকে মেয়েটার দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি শেষ হয়ে গেছে ; তার কোমরের তলার দিকটা শরীর থেকে আলগা হয়ে যেন ঝুলে পড়ছে। ভরোসালাল দিশেহারা হয়ে পড়ল। গর্ভিণী মেয়েটাকে সে কথা দিয়েছে, শেরমুণ্ডি পাহাড় পার করে দেবে। কিন্তু এখন এই অবস্থায় কীভাবে যে তার এবং তার পেটের বাচ্চাটাকে রক্ষা করবে—ভেবে পাচ্ছে না।

কয়েকটা মুহূর্ত। তারপরেই মনে মনে ভরোসালাল সব স্থির করে ফেলল।

মেয়েটার শরীরের যা হাল তাতে তাকে আর হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। তা ছাড়া সেই পিপুল গাছটার মতো ঝাঁকড়া-মাথা এমন কোনো গাছ নেই যার তলায় গিয়ে কিছুক্ষণ মাথা গোঁজা যেতে পারে। আর বৃষ্টিটা এবার যেভাবে শুরু হয়েছে তাতে আদৌ থামবে কিনা কিংবা থামলে কখন থামবে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনিশ্চিতভাবে ভেজার চাইতে এগুবার চেষ্টা করাই ভাল।

ভরোসালাল করল কি, কাদা কম—এমন একটা জায়গা দেখে মেয়েটাকে শুইয়ে দিল। তারপর বাঁ কাঁধের লাঠির ডগায়-বাঁধা সেই চিত্র বিচিত্র ঝুলিটা নামিয়ে, তার ভেতর থেকে দুটো ধুতি বার করে দ্রুত একটা বড় ঝোলা বানিয়ে ফেলল। মেয়েটাকে সেই ঝোলার ভেতর বসিয়ে, তার পাশে মকাইগুলো রেখে নিজের পিঠে ঝুলিয়ে নিল। তারপর কাদার ভেতর পায়ের বুড়ো আঙুল গিঁথে গিঁথে খুব সাবধানে পাহাড়ের গা বাইতে লাগল। দায়িত্ব যখন নিয়েছে তখন মেয়েটাকে নিরাপদে পাহাড় পার করে দিতেই হবে।

আকাশ থেকে লক্ষকোটি বৃষ্টির রেখা বল্লমের ফলার মতো ছুটে আসছিল। ঝড়ে চারপাশের অর্জুন-শাল-আমলকী আর সিসম গাছগুলো একেক বার মাটিতে নুয়ে পড়ছে, পরক্ষণেই সটান খাড়া হয়ে যাচ্ছে। ঝোপঝাড় উল্টোপাল্টা ক্ষ্যাপা বাতাসে ছিঁড়ে খুঁড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছিল। আকাশের গায়ে বড় বড় ফাটল ধরিয়ে বিদ্যুৎ চমকে

যাচ্ছে। ঝড়বৃষ্টির সর্বনাশা চেহারা দেখতে দেখতে ভরোসালাল সমানে বলে যেতে লাগল, 'হো রামজী তেরে কিরপা, হো রামজী তেরে কিরপা—' বলতে বলতে থকথকে আঠালো কাদায় পায়ের আঙুল-গুলোকে গজালের মতো গেঁথে গেঁথে সে ওপরে উঠতে লাগল।

পিঠে একটা ভরা গর্ভিণী মেয়ের বাচ্চাসুদ্ধু দেহের সমস্ত ভার চাপানো। যদিও ভরোসালাল হট্টাকাট্টা দুর্দান্ত শক্তিশালী মরদ তবু তার শিরদাঁড়া যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল; শ্বাস আটকে আটকে আসছিল। তুমুল বৃষ্টি অনবরত চোখমুখে এমন ঝাপটা দিয়ে যাচ্ছে যাতে সামনেব কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না ভরোসালাল। তা ছাড়া দারুণ ঝড়ো হাওয়া তাকে ঠেলে দশ হাত একদিকে নিয়ে যাচ্ছে, পর মুহূর্তেই ধাক্কা মারতে মারতে পনের হাত অন্য দিকে সবিয়ে নিচ্ছে। জলে আর হাওয়ায় তার চোখ অন্ধ হয়ে যাচ্ছে যেন। তারই মধ্যে এই প্রচণ্ড দুর্যোগের বিরুদ্ধে শরীরটাকে ঢালের মতো খাড়া রেখে ভরোসালাল নিশানা ঠিক করে এগিয়ে যেতে লাগল আর কাতর স্বরে একটানা বলে যেতে লাগল, 'হো রামজী তেরে কিরপা, তেরে কিরপা—'

কতক্ষণ পর খেয়াল নেই, শেরমুণ্ডি পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে যখন সে ওপারে গিয়ে নামল তখন বৃষ্টির দাপট থেমে এসেছে। ঝড়টাও আর নেই। আকাশের গায়ে মেঘ ক্রমশ পাতলা হয়ে যাচ্ছে। পিঠ থেকে মেয়েটাকে নামিয়ে ভরোসালাল দু-হাঁটুতে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ হাঁপাল; তার শরীরের সব শক্তি তখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। ভরোসালালের মনে হচ্ছিল শরীরের একটা হাড়ও আর আস্ত নেই; সব ভেঙেচুরে গেছে। শিরাটিরাগুলো ছিঁড়ে যাচ্ছে। ঘাড়ের তলা থেকে অসহ্য একটা যন্ত্রণা শিরদাঁড়া বেয়ে কোমরে, কোমর থেকে পা পর্যন্ত চমক দিয়ে দিয়ে যেন ছুটে যাচ্ছিল।

অনেকক্ষণ বাদে খানিকটা ধাতস্থ হবার পর হঠাৎ সেই মেয়েটার কথা মনে পড়ে গেল ভরোসালালের। ধড়মড় করে মুখ তুলতেই দেখতে পেল তার সারা গা, শাড়ি-জামা—সব ভিজে সপসপে হয়ে

আছে। শরীরের চামড়া আর আঙুলের ডগাগুলো সিঁটিয়ে সাদা হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে যেই তার মুখের দিকে চোখ পড়ল অমনি চমকে উঠল ভরোসালাল। মেয়েটার মুখ অসহ্য কষ্টে কুঁচকে যাচ্ছে; ঠোঁটদুটো নীলবর্ণ। দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণা চাপতে চেষ্টা করছে সে। ভরোসালাল ভয় পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি মেয়েটার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হল?'

নিজের পেটের কাছটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গোঙানির মতো শব্দ করল মেয়েটা, 'এখানে বহোত দর্দ (ব্যথা)। জলদি আমাকে অসপাতাল নিয়ে চল—'

পাহাড়ের তলা থেকে টাউন ভকিলগঞ্জ ঝাড়া পাঁচটি মাইল তফাতে। সেখানে পৌঁছুতে না পারলে হাসপাতাল যাওয়া যাবে না। ভরোসালাল শুধলো, 'তুমি কি হেঁটে যেতে পারবে?'

'নহী। আমার কোমর পেট ছিঁড়ে যাচ্ছে।'

ভরোসালাল সেটাই আন্দাজ করছিল। এ অবস্থায় উঠে দাঁড়িয়ে একটা পা ফেলাও মেয়েটার পক্ষে সম্ভব না। এদিকে ভরোসালালের শরীরে এমন শক্তি আর অবশিষ্ট নেই যাতে তাকে পিঠে ঝুলিয়ে আরো পাঁচ মাইল হেঁটে যেতে পারে। মেয়েটাকে পাহাড় পার করাতেই তার জিভ বেরিয়ে গেছে।

অবশ্য এই শেরমুণ্ডি পাহাড়ের তলায় ছোটখাটো একটা বাজার আছে। নামেই বাজার। একটা চাল-ডাল-নিমক-মরিচের দোকান, একটা পান-বিড়ি-খৈনি পাতার, তৃতীয় দোকানটা হল চায়ের। ব্যস, এই হলো বাজারের নমুনা। তার গা ঘেঁষে একটা আঁকাবাঁকা কাঁচা সড়ক জনারের খেত, গেঁহুর ক্ষেত, যবের ক্ষেত আর এলোমেলোভাবে ছড়ানো নানা দেহাতের মধ্য দিয়ে টাউন ভকিলগঞ্জের দিকে চলে গেছে। ওই বাজারটার কাছে গেলে শহরে যাবার বয়েল গাড়ি পাওয়া যায়। তক্ষুনি তার খেয়াল হল, গাড়ি ভাড়া করলে কম করে পাঁচটি টাকা লাগবে। ঠাকুর রঘুনাথ সিংয়ের দেওয়া দশটি টাকা তার

ট্যাঁকে গোঁজা আছে। এই তার শেষ সঞ্চয়। ওই টাকা খরচ করা ঠিক হবে কিনা, ভাবতে লাগল ভরোসালাল। আর তখনই কানে অস্পষ্ট গোঙানির মতো আওয়াজটা এসে ধাক্কা দিল। ঘাড় ফেরাতেই সে দেখল, পেটের মাংস এক হাতে খিমচে ধরে থেকে থেকে কাতর শব্দ করে উঠছে মেয়েটা।

আর কিছু ভাবার সময় পেল না ভরোসালাল। কেউ যেন আচমকা টান মেরে তাকে দাঁড় করিয়ে দিল। এক দৌড়ে বাজারের কাছ থেকে একটা বয়েল গাড়ি নিয়ে এল সে। তারপর পাঁজাকোলা করে মেয়েটাকে ছইয়ের তলায় নিয়ে শুইয়ে দিল। গাড়িওলাকে বলল, 'জলদি টেউন চল ভেইয়া ; বহোত জলদি—'

গাড়িওলা 'উর্-র্ র্—' বলে একটা শব্দ করে দুটো বয়েলেরই ল্যাজ মুচড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সে দুটো কাঁচা রাস্তা দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় লাগাল।

এদিকে আকাশ দ্রুত পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। মেঘের গায়ে অল্প অল্প ফাটল ধরিয়ে মরা মরা নির্জীব রোদ বেরিয়ে আসতে চাইছিল। রোদের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, বেলা ফুরিয়ে এসেছে ; একটু পরেই সন্ধ্যা নেমে যাবে।

গাড়িতে উঠবার পর থেকে ভরোসালাল কোনো দিকে আর তাকায়নি ; মেয়েটাকেই শুধু লক্ষ্য করে যাচ্ছে। মেয়েটা কাত হয়ে বুকের কাছে হাত-পা গুটিয়ে অনবরত গুঙিয়ে যাচ্ছিল আর চোয়াল শক্ত করে শ্বাস আটকে যন্ত্রণা চাপবার চেষ্টা করছিল। ভরোসালাল ঝুঁকে খুব নরম গলায় শুধলো, 'এ জেনানা, খুব কষ্ট হচ্ছে?'

মেয়েটা শক্ত করে দাঁতে দাঁত চেপে মাথা নাড়ল শুধু ; কিছু বলল না।

ভরোসালাল যে কী করবে, কী করলে মেয়েটার কষ্ট একটু কমতে পারে—ভেবে পেল না। সে শুধু শ্বাসরুদ্ধের মতো বিড় বিড় করতে লাগল, 'হো রামজী তেরে কিরপা, হো পবনসুত তেরে কিরপা—'

মেয়েটা এবার বলল, 'আমার বহোত ডর লাগছে।'

পরম মমতায় তার একটা হাত ধরে ভরোসালাল বলল, 'ডর কী?'

মেয়েটার যন্ত্রণা যেন হঠাৎ পাঁচগুণ বেড়ে গেল। শরীরটা ধনুকের মতো বেঁকে যেতে লাগল তার ; কপাল-গলা-কণ্ঠা সব ঘামে ভিজে যাচ্ছে। গায়েব লোমগুলো হঠাৎ শীত লাগার মতো খাড়া হয়ে উঠেছে। চোখের তারা আস্তে আস্তে স্থির হয়ে যাচ্ছে।

ভরোসালাল অস্থির হয়ে উঠল। এই মেয়েটা পনের মাইল রাস্তা পেরিয়ে, মাঝখানে বিশাল এক পাহাড় ডিঙিয়ে মানুষের জন্ম দিতে চলেছে। মানুষ সম্বন্ধে প্রায় অনভিজ্ঞ ভরোসালাল জানে না কীভাবে তার শুশ্রূষা করবে। ভীতভাবে সে বলল, 'এ জেনানা, তোমাদের এ সময় কী করতে হয়?'

কোমরের কাছটা ধরে মেয়েটা অত্যন্ত দুর্বল স্বরে বলল, 'এখানে একটু সেঁক দিয়ে দাও—'

এই বয়েল গাড়ির ভেতর কোথায় আগুন, কোথায় বা কী। কিন্তু যেভাবেই হোক সেঁকটা দিতেই হবে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো এদিক-সেদিক তাকাতে তাকাতে ভরোসালালের চোখে পড়ল গাড়ির ছইয়ের নিচে এক ধারে একটা হেরিকেন ঝুলছে। সঙ্গে সঙ্গে সে ঘাড় ফিরিয়ে গাড়িওলাকে বলল, 'ভেইয়া, তোমার হেরিকেনে তেল আছে?'

গাড়িওলা বলল, 'আছে, কেন?'

'ওটা একটু জ্বালব। এই জেনানাকে সেঁক দিতে হবে।'

'জ্বালতে পারো, তবে তেলের জন্য চার আনা দিতে হবে।'

'দেব।'

'তব্‌ ঠিক আছে।'

'তোমার কাছে আগ্‌ (আগুন) আছে?'

'আছে।' গাড়িওলা কোমরের খাঁজ থেকে একটা দেশলাই বার করে ছুঁড়ে দিল।

ভরোসালাল হেরিকেন ধরিয়ে নিল। তারপর নিজের একটা কাপড়ের খানিকটা অংশ চার ভাঁজ করে হেরিকেনটার মাথায় বসিয়ে গরম করতে লাগল। বেশ তেতে উঠলে আস্তে আস্তে মেয়েটার কোমরে সেঁক দিতে লাগল। অনেকক্ষণ সেঁক দেবার পর গোঙাতে গোঙাতে এক সময় মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়ল।

সন্ধ্যার অনেক পর বয়েল গাড়িটা টাউন ভকিলগঞ্জের সরকারী হাসপাতালে পৌঁছে গেল।

কিন্তু এত রাতে ডাক্তার সাহেবকে পাওয়া গেল না। তিনি তাঁর কোয়ার্টারে চলে গেছেন।

হাসপাতালেব অন্য লোকজন জানালো, 'আজ তো হবে না; কাল নিয়ে এসো।'

ভরোসালালের মাথায় তখন পাহাড় ভেঙে পড়ার অবস্থা। মেয়েটাকে নিয়ে এই রাত্তিরে কোথায় যাবে সে? কোথায় তাকে রাখবে? সবার কাছে সে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল, 'কিরপা করে জেনানাকে ভর্তি করে নিন।'

হাসপাতালের অন্য লোকজন জানালো, ডাক্তারসাব অর্ডার না দিলে কাউকে ভর্তি করা যাবে না। তখন মরিয়া হয়ে ডাক্তারসাবের কোয়ার্টারের ঠিকানা নিয়ে খুঁজে বার করল ভরোসালাল। তারপর তাঁর হাতেপায়ে ধরে, কীভাবে কত কষ্ট করে গর্ভিণী মেয়েটাকে পাহাড় পার করিয়ে এত দূরে নিয়ে এসেছে তার যাবতীয় বিবরণ দিয়ে বলল, 'এখন আপনার কিরপা ডাগদরসাব (ডাক্তার সাব)।'

সব শুনে ডাক্তার সাব হাসপাতালে এসে মেয়েটাকে ভর্তি করে নিলেন।

এবার ভরোসালালের দায়িত্ব শেষ। গাড়িওলাকে ভাড়া বাবদ পাঁচ টাকা আর তেলের দরুন চার আনা দিয়ে, আজ রাতের মতো একটা আস্তানার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল ভরোসালাল।

পৃথিবীতে কেউ নেই তার। কাজেই পিছুটানও নেই। সে একেবারে ঝাড়া হাত-পা লোক। যখন যেখানে যায় সেখানে নিজের হাতে খানকতক রুটি সেঁকে নেয়। তারপর কারো বাড়ির দাওয়ায় কিংবা মাঠে-ঘাটে গাছতলায় শুয়ে পড়ে।

আজ আর কিছুই ভাল লাগছিল না ভরোসালালের। আটা কিনে এনে ছানো, উনুন বানাও, কাঠকুটো জোগাড় করো—এত সব ঝঞ্ঝাট একটা দিনের জন্য সে বাদ দিতে চায়। ভরোসালাল করল কি, একটা দোকানে গিয়ে তেঁতুলের আচার আর নুন-লঙ্কা দিয়ে একদলা ছোলার ছাতু খেয়ে এসে এক বাড়ির খোলা বারান্দায় শুয়ে রইল। কাল সকালে সে সগরিগলি ঘাটে যাবে। সেখান থেকে টাউন পূর্ণিয়া।

পরের দিন সকালে উঠে সগরিগলি ঘাটে যাবার সময় হঠাৎ ভরোসালালের মনে হল, মেয়েটার একটা খবর নিয়ে গেলে হয়। অন্যমনস্কর মতো হাঁটতে হাঁটতে একসময় সে হাসপাতালেই এসে পড়ল এবং খবর নিয়ে জানল, এখনও মেয়েটার ছেলেপুলে কিছু হয়নি ; তবে যে কোনো মুহূর্তে হয়ে যেতে পারে। আর জানল, মেয়েটা ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছে।

শেষ খবরটা পেয়ে মন খারাপ হয়ে গেল ভরোসালালের। পৃথিবীর সব ব্যাপারেই সে উদাসীন। তবু কাল পিঠে চাপিয়ে যাকে পাহাড় পার করিয়েছে, যার জন্য নিজের সঞ্চয় থেকে নগদ সোয়া পাঁচ টাকা খরচও করে ফেলেছে, গরম সেঁক দিয়ে যার সেবা করেছে, তার খুব কষ্ট হচ্ছে জেনে আজ আর সগরিগলি যেতে মন সরছে না। সে ঠিক করে ফেলল, ভালোয় ভালোয় মেয়েটার বাচ্চা-টাচ্চা হয়ে গেলে সে পূর্ণিয়া টাউনে যাবে। গিয়ে হয়ত দেখবে

মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরা ক্ষ্যাপা কুকুর মারার জন্য অন্য লোক লাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কী আর করা যাবে। 'হো রামজী, হো পবনসুত—'

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এদিক সেদিক খানিক ঘুরে বেড়াল ভরোসালাল। তারপর রুটি বানিয়ে খেয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকল। ঘুম থেকে উঠে বিকেলে আবার সে এল হাসপাতালে। কিন্তু কোনো খবর নেই। রাতটা কাটিয়ে পরের দিন সকালে আর বিকেলে আরো দু'বার এল ভরোসালাল। খবর নেই।

দু'দিন কাটবার পর উদ্বেগে তার দম যখন বন্ধ হয়ে আসছে সেই সময় ডাক্তার সাব হাসতে হাসতে বললেন, 'বহুত বঢ়িয়া খবর—'

ভরোসালাল বলল, 'হো গিয়া ডাগদরসাব ?'

'হো গিয়া।'

'রামজীকা কিরপা, পবনসুতকা কিরপা—' ভরোসালালের চোখে আলো ঝিলিক দিয়ে গেল।

'তোমার জেনানার লেড়কা হয়েছে। বহুত গোরা (ফর্সা) লেড়কা—'

চমক ভাঙল ভরোসালালের। ডাগদরসাব নিশ্চই মেয়েটাকে তার আওরত ধরে নিয়েছে। ভুল শুধরে দেবার জন্য তাড়াতাড়ি সে বলে উঠল, 'ও আমার আওরত না ডাগদারসাব।'

'তব্ ? ডাক্তার সাব ভুরু কুঁচকে তাকালেন।

ভরোসালাল বলল, 'রাস্তায় আসতে আসতে জান-পয়চান (আলাপ-পরিচয়) হয়েছিল।'

'তুমি না সেদিন বলেছিলে বারিষের মধ্যে ঝড়ের মধ্যে ওকে ঘাড়ে করে নিয়ে এসেছ ?'

'হাঁ।'

'ব্যাপারটা কী! জানা নেই শোনা নেই, একটা মেয়েমানুষের

জন্যে এত সব করলে ! ডাক্তারবাবু এবার বিস্মিত, অবাক।

ভরোসালাল সারা মুখে পৃথিবীর সব চাইতে নিষ্পাপ হাসিটি হাসল। বলল, 'দুনিয়ায় একটা মানুষ আসছে। স্রিফ উসি লিয়ে—'

সে একটা হিংস্র বীটার, জঙ্গলহাঁকোয়া, একটা নিষ্ঠুর কুকুরমারা। তবু যেন বোঝাতে চাইল, পৃথিবীতে মানুষের সন্তান জন্ম নিচ্ছে ; তার জন্য সামান্য এই কষ্টটুকু কিছুই নয়।

ডাক্তারসাব কি উত্তর দেবেন, ভেবে পেলেন না। বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইলেন।

ভরোসালাল বলল, 'আচ্ছা চলি ডাগদরসাব ; রাম রাম।'

এবার পরম নিশ্চিন্তে সগরিগলি ঘাট পেরিয়ে সে পূর্ণিয়া যেতে পারবে।

চুনাও

মনকোহল জল-অচল কোয়েরিদের গাঁ। কোয়েরিরা হলো গরীব হাভাতে ক্ষেতমজুর। ওরা অবশ্য নিজেদের কোয়েরি বলে না। জাতওয়ারি সওয়াল অর্থাৎ জাতের প্রশ্ন উঠলে গর্ব করে জানায়, তারা 'কুশবাহাছত্রি।'

যৎসামান্য ক্ষেতিটেতি তাদের যা আছে তাতে পুরা সালের খোরাকি হয় না। পেটের দানার জন্য বছরের বেশির ভাগ সময় ঘাড় গুঁজে বড় বড় জমিমালিকের ক্ষেতিতে ওদের খাটতে হয়।

স্বাধীন ভারতের যেদিকে সুখী উজ্জ্বল তৃপ্ত মানুষেরা থাকে তার উল্টো পিঠে দক্ষিণ বিহারের এই মনকোহল গাঁ। এখানে বিজলী বাতি আসেনি, পাঁচ 'মিলে'র ভেতর পাক্কী বা পাকা সড়ক নেই। মান্ধাতার বাপের আমলে 'গরমিন অফসরেরা' (সরকারী কর্মচারীরা) এখানে একটা টিউবওয়েল বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। কবেই সেটা ভেঙেচুরে গেছে। 'বারিষে'র সময় অর্থাৎ বর্ষাকালটা বাদ দিলে 'পীনেকো পানি' আর চাষের জলের জন্য বহুকালের প্রাচীন একটা নহরের উপর নির্ভর করতে হয়।

উত্তরে—অনেক দূরে আকাশের গা ঘেঁষে পাহাড়ের ধোঁয়াটে একটা রেখা চোখে পড়ে।

এখানকার মাটি শক্ত এবং কিছুটা কালচে। বর্ষাকাল ছাড়া বাকি দশ মাস ধুলো, মচ্ছড়, বুখার (রোগ), শীতে বেজায় হিম, গরমে

আগুনের মতো গনগনে রোদ—এই নিয়ে কোয়েরিদের এই গাঁ।

মাঘ মাস শেষ হয়ে এসেছে। আর ক'দিনের মধ্যেই ফাগুন পড়ে যাবে। শীতের দাপট অনেক কমে এসেছে।

এ মাসের গোড়াতেই ধান উঠে গিয়েছিল। চারদিকের ক্ষেত-গুলো এখন একেবারে ফাঁকা। ঠিক ফাঁকা নয়, কোনো কোনো দু-ফসলী জমিতে মাটি ফাটিয়ে রবি শস্য মাথা তুলেছে।

দুপুর পেরিয়ে গেছে বেশ খানিকক্ষণ আগেই। সূর্য পছিমা আকাশের ঢাল বেয়ে অনেকটা নেমে গেছে।

আজ সকাল থেকেই মনকোহল গাঁ-টা ভয়ানক অস্থির। সেই সঙ্গে খুবই চিন্তাগ্রস্ত। এক ধরনের ভয় এবং অনিশ্চয়তা গোটা গাঁ-টার ওপর ভর করে আছে যেন।

দুশ্চিন্তার কারণটা এই রকম। দুবেজী খবর পাঠিয়েছেন, আজ বিকেলে এখানে আসবেন। বিশেষ দরকার। সবাই যেন গাঁয়ে থাকে ; কোনো কারণেই বাইরে কোথাও না যায়।

দুবেজী বলতে সৌভাগ্যনাথ দুবে। এ অঞ্চলের সব চাইতে বড় জমিমালিক। কোয়েরিদের ধারণা, দশ বিশ 'মিলে'র মধ্যে বেশির ভাগ জমিই তাঁর। এ ছাড়া আছে শ তিনেক গৈয়া এবং ভৈসা গাড়ি। ঘোড়ায় টানা ফীটন আছে আট দশটা। বড় বড় চাকাওলা পুরনো আমলের মোটরও আছে একটা।

দুবেজী থাকেন এখান থেকে কমসে কম বারো 'মিল' তফাতে ছোটখাটো এক টৌনে (টাউনে)। নাম দুধলিপুরা। সেখানে তাঁর তিন চার মহলা প্রকাণ্ড কোঠি। শোনা যায়, পাটনা আর ধানবাদে দুবেজীর আরো পাঁচ ছ'টা বিরাট বিরাট বাড়ি আছে।

গরীবের চাইতেও গরীব কোয়েরিদের কাছে দুবেজীর মতো বড়া আদমীর কী প্রয়োজন থাকতে পারে, কে জানে। সময় যত যাচ্ছে ততই উদ্বেগ বাড়ছে কোয়েরিদের। দুপুরের পর থেকে সবাই চন মন

করে বার বার দূরের উঁচু রাস্তাটার দিকে তাকাচ্ছে। ওটা দিয়েই তুবেজী তাঁর মোটরিয়া বা ঘোড়ায় টানা ফীটন হাঁকিয়ে আসবেন ।

এ-গাঁয়ের মানুষদের মধ্যে সব চাইতে বেশি অস্থিরতা আর উৎকণ্ঠা ভরোসারামের। সে মনকোহলের মুরুব্বি এবং 'পঞ্চ'-এর মাথা। তুবেজী বিশেষ করে জানিয়েছেন, সে যেন অবশ্যই থাকে। অথচ আজ তুপুরে ছেলের সাদির ব্যাপারে তার নৈটেয়ার গাঁয়ে যাবার কথা ছিল।

এ বছর এদিকে প্রচুর ধান হয়েছে। তাছাড়া বড় জমিমালিকদের ক্ষেতিতে 'গতর চূরণ' খাটুনি দিয়ে ভাল মজুরি পাওয়া গেছে। মাঘ মাসের শুরুতে ফসল উঠবার সঙ্গে সঙ্গে ভরোসারাম ঠিক করে রেখেছিল, বড় ছেলে শিউনাথের সাদি দেবে। শিউনাথের বয়স পুরা তেইশ। কোয়েরিদের ঘরে এই বয়সের জোয়ান ছেলে কুঁয়ার (অবিবাহিত) পড়ে থাকে না।

ছেলের জন্য চার 'মিল' তফাতে নৈটেয়ার গাঁয়ে স্বজাতের একটা মেয়েকে পছন্দও করে রেখেছে ভরোসারাম। মেয়েটার রাহান সাহান চালচলন, সবই চমৎকার। তাব দিকে তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। এমন খুবসুরত লড়কী বামহন-কায়াথদের ঘরেও ক্বচিৎ কখনও চোখে পড়ে। এ ছৌরি বিলকুল 'লাখো মে এক।'

কিন্তু মুশকিল হয়েছে মেয়ের বাপ মুসাফিরলালকে নিয়ে। মেয়ের দর সে হেঁকেছে পুরা আড়াই শো টাকা। এদিকে কয়েক সাল ধরে অনেক তখলিফ করে তুশোটা টাকা জমিয়েছে ভরোসা-রামেরা। আরো পঞ্চাশ টাকা জমাতে জমাতে ছেলের চুল আর কালো থাকবে না, আধাআধি সফেদ হয়ে যাবে। ততদিন নিশ্চয়ই মেয়েকে ঘরে বসিয়ে রাখবে না মুসাফির ; অন্য জায়গায় সাদি দিয়ে দেবে।

পঞ্চাশটা টাকা কমাবার জন্য মুসাফিরের হাতে পায়ে ধরেছে ভরোসারাম। কিন্তু লোকটা এমনই চামার যে এত কাকুতিমিনতিতেও এতটুকু নরম হয়নি। আড়াই শো থেকে এক সিকি পয়সাও সে

কমাবে না। নেহাত মেয়েটাকে পছন্দ হয়ে গেছে আর শিউনাথেরও মন পড়েছে তার ওপর, তাই এত ধরাধরি।

পঞ্চাশটা টাকা মনকোহল গাঁয়ের সুদখোর মহাজন রামনগিনা ঠাকুরের কাছ থেকে 'করজ' নেওয়া যায় কিন্তু ভরোসারাম সাহস পায় না। কোয়েরিদের, শুধু কোয়েরিদের কেন, এ অঞ্চলের দোসাদ, গঞ্জু, ধোবি—অর্থাৎ এ রকম অচ্ছুৎ আনপড়দের (অশিক্ষিত) মধ্যে যারাই সাদা কাগজে অঙ্গুঠার ছাপ মেরে টাকা 'করজ' নিয়েছে তাদের সব জমিজমা একদিন রামনগিনার পেটে ঢুকে গেছে।

ভরোসারাম ভেবেই রেখেছিল, আজ তাড়াতাড়ি দুপুরের খাওয়া চুকিয়ে নৈটেয়ারে গিয়ে মুসাফিরলালের কাছে হাতজোড় করে শেষ চেষ্টা করবে। কিন্তু তার ঘাড়ে একটার বেশি দুটো মাথা নেই যে দুবেজীর হুকুম অগ্রাহ্য করে গাঁ ছেড়ে বেরোয়।

সূর্যটা আকাশের গা বেয়ে আরো খানিকটা নেমে যাবার পর আচমকা কোয়েরিদের চোখে পড়ে দূরের চওড়া কাঁচা সড়কটা ধরে ধুলো উড়িয়ে দুবেজীর মোটর আসছে।

সৌভাগ্যনাথের পুরনো মডেলের এই মোটরটার অলৌকিক ক্ষমতা। উচুনিচু ক্ষেতি, ঢেউখেলানো মাঠ বা ভাঙাচোরা মেটে সড়ক—যে সব জায়গা দিয়ে দুনিয়ার কোনো গাড়িরই যাতায়াত সম্ভব না, সেখান দিয়ে দুবেজীর এই 'মোটরিয়া' অবলীলায় ছুটতে থাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যে দুবেজীর গাড়ি মনকোহল গাঁয়ের সামনের খোলা জায়গায় এসে থামে।

গাড়িটা দেখেই গাঁয়ের ভেতর থেকে কোয়েরিরা দৌড়ে বেরিয়ে আসে। সবার আগে রয়েছে ভরোসারাম।

এদিকে মোটরটা থেকে দুবেজী নেমে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে জন তিনেক লোক রয়েছে। তারাও নেমে পড়েছে। আর যে গাড়িটা চালিয়ে এনেছে সেই হট্টাকট্টা চেহারার প্রকাণ্ড চৌগাঁফাওলা ড্রাই-

ভারটা গাড়ি থেকে গদিমোড়া সিংহাসনের মতো বিরাট একটা চেয়ার নামিয়ে এনে দুবেজীর ঠিক পেছনে রাখে।

এ অঞ্চলে দশ বিশ 'মিলে'র মধ্যে তাবত গাঁ-গঞ্জ-টৌন বা বাজারের লোকেরা জানে, দুবেজী যেখানেই যান এই চেয়ারটা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যায়। অন্যের চেয়ারে বা আসনে তিনি কখনও বসেন না।

দুবেজীর বয়স ষাটের কাছাকাছি। তবে অতটা দেখায় না। ঘিউ-মাখন বাদাম-পেস্তা খেয়ে খেয়ে আর অলস সময় কাটিয়ে এদিকের বড় জমিমালিকরা একেকটা চর্বির পাহাড় হয়ে উঠেছে। দুবেজী সেরকম নন। নিয়মিত কুস্তী লড়ে লড়ে তাঁর চেহারা পহেলবানদের মত হয়ে উঠেছে। বাজে চর্বি নেই শরীরে। কোমর সিংহের মতো সরু। চওড়া বুক। মোটা গর্দান। গায়ে শেরের তাকত। চৌকো মুখ, ছোট ছোট গোল চোখ, নাকের তলায় মোমে-মাজা সরু গোঁফ। ছোট ছোট করে ছাটা চুল। মাথার পেছনে মোটা টিকির আগায় গিঁট বাঁধা।

মানুষটি সৌখিন। তাঁর পরনে ফিনফিনে ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবি। পায়ে পেতলের ফুল বসানো নাগরা। গলায় সরু হারের সঙ্গে বাঘনখের লকেট। দু-হাতে হীরে-মোতি-চুনী-পান্না বসানো আটটা আংটি।

দুবেজী চেয়ারটায় বসে কোয়েরিদের জটলাটার দিকে ধীরে ধীরে চোখ বুলিয়ে নিলেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হল, এদের দেখে তিনি বেশ সন্তুষ্টই হয়েছেন।

শেষ কবে মনকোহল গাঁয়ে দুবেজী এসেছিলেন, কোয়েরিদের কেউ মনে করতে পারে না। অন্তত পাঁচ সাত সালের মধ্যে যে আসেননি, এ ব্যাপারে সবাই নিশ্চিত। আকণ্ঠ উদ্বেগ নিয়ে কোয়েরিরা হাতজোড় করে মাথা ঝুঁকিয়ে বলে, 'নমস্তে সরকার—'

সৌভাগ্যনাথ দুবে ডান হাতটা সামান্য তুলে বললেন, 'তোদের সাথ একটা জরুরী কথা আছে। তাই খুদ আমাকেই আসতে হল।'

কেউ প্রশ্ন না করে উদগ্রীব তাকিয়ে থাকে।

খানিকক্ষণ কী ভেবে দুবেজী বললেন, 'আবার যে চুনাও (নির্বাচন) আসছে সে খবর রাখিস ?'

পাঁচ বছর পর পর যে নির্বাচন আসে, ছাপানো কাগজে মোহর মেরে যে ভোট দিতে হয়—এ খবরটা মোটামুটি কোয়েরিদের জানা। মাস খানেক আগে 'ধানকাটাই' যখন পুরাদমে চলছে তখন 'গরমিন অফসরেরা' মনকোহলে এসে তাদের নাম ঠিকানা উমর লিখে নিয়ে গিয়েছিল। সৌভাগ্যনাথ চুনাওর কথা বলায় সেই ব্যাপারটা মনে পড়ে গেল।

কোয়েরিদের প্রতিনিধি হিসেবে খুবই বিনীতভাবে ভরোসারাম শুধোয়, 'চুনাও কব্ সরকার ?'

দুবেজী জানান, এবারের নির্বাচন দু মাস পর। অর্থাৎ চৈত মাসের শেষের দিকে—রবিশস্য উঠে গেলে।

চুনাওয়ের তারিখ যে এত কাছে এসে পড়েছে ভরোসারামরা ভাবতে পারেনি।

দুবেজী আবার বলেন, 'আমি এবাব চুনাওতে নেমেছি। ভোটে আমার মার্কা হল মেজুর (ময়ূর)। সমঝা ?'

'হাঁ হুজৌর—'

'কা মার্কা হামনিকো ?'

ভরোসারাম এবং অন্য কোয়েরিরা একসঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে, 'মেজুর সরকার।'

কোয়েরিদের মাথার ভেতর নিজের নির্বাচনী প্রতীকটি ঢুকিয়ে দিতে পেরে রীতিমত খুশীই হন দুবেজী। বলেন, 'মেজুরের কথাটা মনে রাখবি।'

'রাখব হুজৌর—'

'চুনাওর দিন ভোটের বাবুরা যে কাগজ দেবে তাতে মেজুরের ছাপ দেখে মোহর মারবি। তা হলেই ভোটটা আমি পেয়ে যাব। মনে

থাকবে ?'

তুবেজীর জমিতেই বছরের বেশির ভাগ সময় কোয়েরিরা কাজ করে। অন্য ক্ষেতমালিকদের চাইতে তিনি মজুরিটা বেশ ভালই দেন। এত বড় একটা ইজ্জতদার আদমী নিজে এসে যখন ভোট চাইছেন তখন তাঁর মুখের ওপর 'না' বলা যায় না। সবার হয়ে ভরোসারাম বলে, 'থাকবে সরকার।'

কোয়েরিরা কম করে বিশ হাত তফাতে দাঁড়িয়ে আছে। হাত নেড়ে এবার তুবেজী ভরোসারামকে কাছে ডেকে এনে চাপা নীচু গলায় বলেন, 'তুই তো মনকোহল গাঁওয়ের মুরুব্বি। এখানকার 'পঞ্চ'-এর মাথা—'

ঘাড় নুইয়ে ভরোসারাম বলে, 'আপহিকো কিরপা হুজৌর—'

'এখানকার সবাই তো তোর কথায় চলে—'

ভরোসারাম রীতিমত অবাকই হয়। দেখা যাচ্ছে, দশ 'মিল' দূরের টৌনে থেকেও মনকোহলের সব খবরই রাখেন তুবেজী। তাঁর বোধ হয় বিশ জোড়া কান আর পঁচাশ জোড়া চোখ। ভরোসারাম সবিনয়ে বলে, 'তা চলে সবকার। সব আপহিকো কিরপা।'

গলার স্বরটা এবার আরো খাদে নামিয়ে তুবেজী বলেন, 'এমনি এমনি মুফতে তোদের ভোট চাইছি না। যে আমাকে ভোট দেবে সে দশগো করে রুপাইয়া পাবে। আমি চলে যাবার পর সবাইকে জানিয়ে দিবি। সমঝা ?'

টাকার কথায় ভবোসারামেব মাথায় বিজলীর চমক লাগে। শরীরের বক্ত চলাচল আচমকা দশ গুণ বেড়ে যায়। মনে পড়ে তাদের মোট তিনটে ভোট—তার নিজের, তার জেনানার (স্ত্রীর) এবং তার বড় ছেলে শিউনাথের। অন্য ছেলেমেয়েরা ছোট, তাদের এখনও ভোটের বয়স হয়নি।

তিনজন তুবেজীকে ভোট দিলে তিরিশটা টাকা পাওয়া যাবে। মুসাফিরলালের মেয়ের জন্য তুশো-টাকা হাতেই আছে। আরো

তিরিশটা টাকা পাওয়া গেলে বাকি থাকে বিশ টাকা। ঐ টাকাটার একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে। প্রবল উৎসাহে ভরোসারাম বলে, 'সমঝ গিয়া হুজৌর—'

ডুবেজী বলেন, 'কাল সুবে আমার লোক আসবে। কার ঘরে কগো ভোট জেনে যাবে। তারপর দো-চার রোজ বাদ আবার এসে রুপাইয়া দিয়ে যাবে।'

'আপহিকো কিরপা হুজৌর—'

'লেকেন একগো বাত।'

'কা ?'

'রুপাইয়া নিয়ে কেউ নিমকহাবামি করবি না।'

আধ হাত জিব কেটে, কানে হাত দিয়ে ভরোসারাম বলে, 'নায় হুজৌব, কভি নায়—'

ডুবেজী বলেন, 'আমাকে তো জানিস। আমি হলাম ফুলের মতো—অয়সা নাজুক, অয়সা খুসবুদার। লেকেন গুস্‌সা চড়লে বিলকুল জানবব বনে যাই। নিমকহারামি করলে তোদের গাঁও জ্বালিয়ে দেব—মনে রাখিস।'

ভরোসাবাম চমকে ওঠে। কাঁপা গলায় বলে, 'রাখব মালিক। কেউ আপনাব সাথ নিমকহারামি করবে না।'

এবার গলার স্বর কয়েক পর্দা তুলে অন্য কোয়েরিদের দিকে তাকিয়ে ডুবেজী বলেন, 'ঠিক হ্যায়; আমি আজ চলি। চুনাওতে জিতে আমি এম্লে (এম. এল. এ.) বনলে তোদের ভালাই হবে। এখানে পাক্কী (পাকা সড়ক) বানিয়ে দেব। আংরেজী ইস্কুল বসবে, অসপাতাল হবে, বিজলী বাত্তি ভি আসবে—'

কোয়েরিদের চোখের সামনে রঙিন স্বপ্নময় ভবিষ্যতের একটি ছবি এঁকে ডুবেজী সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে একসময় তাঁর মোটরে গিয়ে ওঠেন। ড্রাইভার সিংহাসনের মতো প্রকাণ্ড চেয়ারটা কেরিয়ারে ঢুকিয়ে দিয়ে স্টার্ট দেয়।

কোয়েরিরা গাড়িটার পেছন পেছন উঁচু কাঁচা রাস্তা পর্যন্ত আসে। তারপর সেটা যখন দূর বাঁকের ওধারে অদৃশ্য হয়ে যায় তখন সবাই গাঁয়ে ফেরে আর ফিরেই ভরোসারাম টাকার কথাটা সবাইকে জানিয়ে দেয়। এক এক ভোট, দশ দশ রুপাইয়া।

টাকার কথায় সারা মনকোহল গাঁয়ে প্রবল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

তবে উত্তেজনাটা বোধ হয় সব চাইতে বেশি ভরোসারামদের সংসারে। কেননা তিনটে ভোটের দাম হিসেবে যে তিরিশটা টাকা পাওয়া যাবে তার সঙ্গে শিউনাথের সাদির ব্যাপারটা জড়িয়ে গেছে।

রাত্তিরে নতুন চালের গরম গরম মাড়ভাত্তা ডাল দিয়ে মেখে খেতে খেতে এই নিয়েই কথাবার্তা হচ্ছিল তাদের।

মাঝখানে কেরোসিনের লালটিন জ্বলছে। সেটার একধারে বসেছে ভরোসারাম, শিউনাথ এবং অন্য তিন ছেলেমেয়ে—মনচনিয়া, টিউনাথ আর সুখিয়া। তাদের একজনের বয়স পনেরো, একজনের বারো, আরেকজনের নয়। এদের কারো ভোটের বয়স হয়নি।

লালটিনের অন্য দিকে ভরোসারামদের মুখোমুখি ভাতের হাঁড়ি, ডাল ও সব্জির বর্তন টর্তন নিয়ে বসে আছে ভরোসারামের জেনানা লখিয়া।

ভরোসারাম তার ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে দেখিয়ে বলছিলেন, 'এই ছৌরাছৌরীগুলোর (ছেলেমেয়েদের) যদি ভোটের উমর (বয়স) হত, আমার আর চিন্তাই থাকত না। দো-চার রোজের ভেতর শিউর সাদি লাগিয়ে দিতাম।'

লখিয়া মাথা নাড়ে। বলে, 'বাকি বিশগো রুপাইয়ার কী হবে?'

'সোচতা হ্যায় (ভাবছি)। কুছ জরুর হো যায়গা। বিশগো রুপাইয়ার জন্যে শিউর সাদি আটকে যাবে না।' বলতে বলতেই হঠাৎ কী মনে পড়ে যায় ভরোসারামের। অবাক হয়েই এবার সে

শুরু করে, 'আ রে—'

লখিয়া বলে, 'কা?'

'নাথুয়া বুড়হাকে আজ দেখছি না যে?'

নাথুর পুরা নাম নাথ্‌ুলাল। সে মনকোহল গাঁয়েরই একজন কোয়েরি। তার বয়স যে কত, ষাট সত্তর আশী না একশো, কেউ জানে না। এমন কি নাথু নিজেও সঠিক বলতে পারে না। অবশ্য তার বয়স নিয়ে মনকোহল গাঁয়ের কোয়েরিদের মাথা ব্যথা নেই।

তুনিয়ায় কেউ নেই নাথ্‌ুলালের। না জেনানা, না ছেলেমেয়ে, না ভাইবোন। সে বিলকুল একা। অল্প একটু জমি ছিল তার। বহুকাল আগে 'করজের' দায়ে সে জমি রামনগিনা ঠাকুরের পেটে ঢ়ুকে গেছে। শরীরে যতদিন তাকত ছিল, সে অন্যের ক্ষেতিতে মোষের মতো খেটে গেছে। তারপর হঠাৎ বুকের দোষ হল। খাটুনির কাজ আর সে করতে পারে না। ফলে কামাইও বন্ধ হয়ে গেছে। ইদানীং ক'বছর নাথ্‌ুলাল পুরোপুরি ভিখমাঙোয়া। কিছুদিন আগেও সে দূর দূর গাঁয়ে বা হাটে ভিক্ষে করতে যেত। আজকাল তাও পারে না। এখন তুপুরে আর রাত্তিরে, তু'বেলা খাওয়ার সময় নাথ্‌ুলাল মনকোহল গাঁয়ের কোয়েরিদের ঘরে ঘরে হানা দেয়। আর সমানে ঘ্যান ঘ্যান করে, 'দে, একগো রোটি দে।' বা 'থোড়াসে মাড়ভাত্তা দে। ভূখে মর যাতা হ্যায়—'

ইচ্ছা হলে কেউ হয়ত আধখানা রুটি দিল, কি এক টুকরো লিট্টি বা এক মুঠো ভাত। তবে মনকোহলের বেশির ভাগ লোকই তাকে দেখামাত্র তাড়িয়ে দেয়। যাদের নিজেদেরই তু'বেলা পেটের দানা ঠিকমতো জোটে না তারা ভিখমাঙোয়াকে কী দেবে! আবার যে একবার দিল, একমাসের মধ্যে নাথ্‌ুলালকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না।

দিক আর নাই দিক, নাথ্‌ুলাল কিন্তু নিয়মিত তু'বেলা মনকোহলের ঘরে ঘরে হানা দিয়ে যায়। খাওয়ার সময় তাকে দেখতে পাওয়াটা কোয়েরিদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

লখিয়া বলে, 'আজ তুফারেও বুড়হা ভাত চাইতে আসেনি।'

সত্যিই তো, ও বেলাও খাওয়ার সময় নাথ্‌লালকে দেখা যায়নি। দুবেজীর আসার ব্যাপারে দুপুরে ভরোসারাম এতই উদ্বিগ্ন ছিল যে তার কথা মনে পড়েনি। সে বলে, 'কা হুয়া নাথ্‌য়াকো?'

'কা জানে।'

'বুড়হার একটা খবর নিতে হয়।' বলে ঝড়ের বেগে খেতে থাকে ভরোসারাম।

এমনিতে নাথ্‌লালকে দেখলে অন্য সবার মতোই বিরক্ত হয় ভরোসারাম। নিজের খাদ্যের ভাগ তুলে দিয়ে কে আর তাব সঙ্গে খাতিরদারি করতে চায়। কিন্তু রুগ্ন, বীমার, দুনিয়া থেকে বাতিল এক ভিখমাঙোয়ার জন্য ভরোসারামকে হঠাৎ এত উৎসাহিত হয়ে উঠতে দেখে সবাই খুব অবাক হয়।

আসলে নাথ্‌লাল সম্পর্কে ভরোসারামেব মাথার বিজরী চমকের মতো অন্য রকম একটা চিন্তা খেলতে শুরু করেছে। পৃথিবীর সবার কাছে খারিজ হয়ে গেলেও চুনাওর চোখে নাথ্‌লাল একটা মূল্যবান মানুষ। তার একটা ভোট আছে যার দাম নগদ দশগো রুপাইয়া। নাথ্‌লালকে ক'টা দিন তোয়াজ করে এই টাকাটা যেভাবে হোক বাগাতেই হবে। তা হলে শিউনাথের সাদি বাবদে বাকি থাকে আর দশটা টাকা। দশ টাকা কোনো সমস্যাই নয়; কোনো না কোনোভাবে যোগাড় হয়ে যাবেই।

লখিয়া শুধোয়, 'ভিখমাঙোয়ার খবর নিয়ে কী হবে? সে এলেই তো খেতে চাইবে।'

চাপা নিচু গলায় এবার নাথ্‌লাল সম্পর্কে নিজের পরিকল্পনার কথাটা জানিয়ে ভরোসারাম বলে, 'হোঁশিয়ার। কাউকে এ কথা বলবি না। গাঁওয়ে বহোত ভূচ্চর হারামজাদ রয়েছে। তারা নাথ্‌য়া বুড়হাকে খাতিরদারি করে দশগো রুপাইয়া হাতাবার চেষ্টা করবে। সমঝা?'

ভরোসারাম সম্পর্কে লখিয়া এবং ছেলেমেয়েদের শ্রদ্ধা আচমকা দশ গুণ বেড়ে যায়। এমন একটা দামী ভাবনা যার মাথায় এসেছে তার দিকে তাকিয়ে অবাক বিস্ময়ে সবাই মাথা নাড়ে। অর্থাৎ এ ব্যাপারটা তারা অবশ্যই গোপন রাখবে।

দ্রুত খাওয়া সেরে শিউনাথকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ভরোসারাম।

মনকোহল গাঁয়ের উত্তর দিকের শেষ মাথায় একটা ভাঙাচোরা ধসে-পড়া মেটে ঘরে থাকে নাথ্‌লাল। ঘরটার চাল টুটোফুটো। ভরোসারাম ঘরটার কাছে এসে ডাকে, 'নাথ্‌ চাচা—' গ্রাম সুবাদে ছেলেবেলা থেকে নাথ্‌লালকে চাচা ডেকে আসছে সে।

প্রথম বার সাড়া মেলে না। দু-চারবার ডাকাডাকির পর ঘরের ভেতর থেকে দুর্বল গোঙানির মতো আওয়াজ ভেসে আসে, 'কৌন রে—'

'হামনিলোগ—ভরোসা আউর শিউ।'

'অন্দর আ যা—'

এখন পুনম চলছে। আকাশে চাঁদির কটোরার মতো গোল চাঁদ উঠে এসেছে। ফিনিক-ফোটা জ্যোৎস্নায় সমস্ত চরাচর ভেসে যাচ্ছে।

ভরোসারাম আর শিউনাথ ঘরে চলে এল। ফুটো চাল দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ভেতরে। সেই আলোয় তারা দেখল, একধারে একটা নোংরা দুর্গন্ধওলা পুরনো কাঁথা গায়ে জড়িয়ে শুয়ে আছে নাথ্‌লাল। ভরোসারামদের দেখে সে রীতিমতো অবাক। হাতের ভর দিয়ে উঠে বসতে বসতে বলে, 'কা রে, ভিখমাঙোয়াকে ঘরমে এত্তে রাতকো?'

কাছাকাছি উবু হয়ে বসে ভরোসারাম। চোখেমুখে আন্তরিক একটা ভঙ্গি ফুটিয়ে বলে, 'তুমি আজ একবারও যাওনি। তাই বহোত চিন্তা হল। তোমার খবর নিতে চলে এলাম। কা, তবিয়ত আচ্ছা নহী চাচা?'

'নহী।' নাথ্‌লাল বলে, 'গায়ে আজ আর তাকত নেই, তাই বেরুতে পারিনি। দুফারে খাঁসির সাথ খুন (রক্ত) উঠেছে অনেক-

খানি। হামনি মর যায়েগা।'

বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে ভরোসারামের। যেভাবেই হোক, চুনাও পর্যন্ত নাথ্থুলালকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। সে বলে, 'গলা দিয়ে খুন উঠলেই মানুষ মরে যায় নাকি? কভী নায়—'

'লেকেন বঁচেগা ক্যায়সা?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে ভরোসারাম বলে, 'আজকের রাতটা থোড়েসে কষ্ট করে কাটিয়ে দাও। কাল সুবে তোমাকে অসপাতাল নিয়ে ডাগডর দেখিয়ে আনব।'

নাথুরাম বলে, 'অসপাতাল তো বহোত দূর। সেই দুধলিপুরা টৌনে। কমসে কম দশ 'মিল' পায়দল যেতে হবে। যাব কী করে? আমার গায়ে অত তাকত নেই।'

'ঘাবড়াও মত। তোমাকে পায়দল যেতে হবে না। আমরা নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব।'

হঠাৎ তার মতো ভিখমাঙোয়ার জন্য ভরোসারামদের এত দরদ উথলে উঠল কেন, ভেবে পায় না নাথ্থুলাল। সে শুধু বলে, 'ভগোয়ান তোদের ভালাই করবে। লেকেন একগো বাত ভরোসা—'

'কা চাচা?'

'কাল অসপাতালে যাবার সৌভাগ আমার হবে না। তার আগেই ফৌত হয়ে যাব।'

'কায় চাচা?'

'কাল সামসে আভিতক কিছু খাইনি। সিরিফ ভুখা আছি। পেটে কিছু না পড়লে রাতটা কি আর কাটবে?'

'ঠিক হ্যায়। তোমার খাওয়ার ব্যাওস্থা করছি।' বলেই শিউ-নাথকে তুরন্ত বাড়ি থেকে ভাত টাত নিয়ে আসতে বলে ভরোসারাম।

কিছুক্ষণ পর গোগ্রাসে ভাত খেতে খেতে নাথ্থুলাল বলে, 'একগো বাত ভরোসা—'

'কা চাচা?'

'কেত্তে রোজ ভুখা থেকেছি, বুখারে কষ্ট পেয়েছি। কই কোনো-দিন তো আমার খবর নিতে আসিসনি। লেকেন আজ কী হল?'

ভরোসারাম একবার ভাবে, চুনাওর টাকা সম্পর্কে নাথ্থুলালের সঙ্গে কথা পাকা করে নেবে। কথাটা এইরকম। সে নাথ্থুলালের দেখ-ভাল করবে। বদলে তার ভোটের দামটা ভরোসারামকে দিতে হবে। কিন্তু পর মুহূর্তেই এই ভাবনাটা বাতিল করে দেয় সে। একেবারে শুরুতেই ওটা বলা ঠিক হবে না। পরে সুযোগ-সুবিধা মতো প্রস্তাবটা করলেই চলবে। ভরোসারাম বলে, 'এত্তে রোজ আসিনি বলে আজ আসতে নেই?'

নাথ্থুলাল বলে, 'নায় নায়, সে কথা বলছি না। মতলব—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে ভরোসারাম বলে, 'এটা ঠিক, এত্তে রোজ তোমাকে দেখতে পারিনি। আমি তো গরীব আদমী। তার ওপর বড়া সম্‌সার, কতগুলো বালবাচ্চা! সব সময় পেটের ধান্দায় ঘুরতে হয়। লেকেন এই শেষ বয়সে যখন বুখারে কষ্ট পাচ্ছ, তোমাকে না দেখে কি পারি! হাজার হোক, আমরা তোমার আপনা আদমী।'

ভরোসারামের কথায় খুশী হয়ে আস্তে আস্তে মাথা দোলায় নাথ্থু-লাল, 'হাঁ-হাঁ, ও তো ঠিক বাত।'

আরো খানিকক্ষণ বাদে নিজেদের ঘরে ফিরে এসে ভরোসারাম আর শিউনাথ বাঁশ দিয়ে একটা চালি বানিয়ে ফেলে। কাল এই চালিতে শুইয়ে নাথ্থুলালকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে তারা।

পরের দিন ভোরে অন্ধকার থাকতে থাকতে মাড়ভাত্তা খেয়ে একটা তোবড়ানো সিলভারের কাটোরায় খানিকটা ভরে নেয় ভরোসারামেরা। তারপর বাঁশের চালিটা নিয়ে দু'জনে নাথ্থুলালের কাছে চলে আসে। তাকে ভাত খাইয়ে চালির ওপর তারই কাঁথা টাথা দিয়ে বিছানা বানিয়ে চিত করে শুইয়ে দেয়। সেই অবস্থায় ভরোসারাম আর শিউনাথ চালিটা তুলে নেয়। সেটার এক মাথা থাকে ভরোসারামের কাঁধে,

আরেক মাথা শিউনাথের। তারপর ভাগোয়ান রামচন্দজী, কিষুণজী আর বজরঙ্গীর নাম করে দুধলিপুরা টৌনের দিকে রওনা হয়ে যায়।

এখনও মনকোহল গাঁ ঘুমে ডুবে আছে। সুরযও ওঠেনি। পুব দিকে আবছামতো একটু আলো ফুটেছে মাত্র।

ঘুমন্ত মনকোহল গাঁ পেছনে ফেলে ভরোসারামেরা দূরের উঁচু সড়কে এসে ওঠে। এই রাস্তাটা বরাবর দুধলিপুরায় চলে গেছে।

খানিকটা যাবার পর চালির ওপর থেকে নাথুলাল ডাকে, 'এ ভরোসা—'

চালির তলা থেকে ভরোসারাম সাড়া দেয়, 'কা চাচা?'

'কাল রাত্তিরে তোরা চলে যাবার পর রোটি সব্জী নিয়ে ভাওনাথ এসেছিল।' নাথুলাল আপন মনে বলে যায়, 'কোনো দিন ভাওনাথ আমার ঘরে আসে না, কোন খবর নেয় না। আচানক আমার মতো ভিখ-মাঙোয়ার ঘরে কেন এল, ভেবে ভেবে আমি তো বিলকুল তাজ্জব।'

ভরোসারাম চমকে ওঠে। বলে, 'কেন এসেছিল ভাওনাথ?'

'তোর মতোই শেষ বয়সে আমাকে ও দেখ-ভাল করতে চাইল। বড়িয়া বড়িয়া অনেক কথা বলল। নিজের হাতে আমাকে চাপাটি-সব্জী খাওয়াল।'

'তুমি খেলে!'

'কেন খাব না? গরমা গরম চাপাটি আউর সব্জী। ভাল পাকিয়েছিল ভাওনাথের বহু।'

ভরোসারামের মনে পড়ে, কাল রাত্তিরে সে-ও নাথুলালকে ভরপেট মাড়ভাত্তা খাইয়েছে। তার পরও চাপাটি খেল! বুড়ো গিধটার পেটে একেবারে জানবরের খিদে।. ভরোসারাম শুধোয়, 'আর কী কী বলল ভাওনাথ?'

নাথুলাল বলে, 'ভাওনাথ বলল আজ সুবে আমাকে অসপাতাল নিয়ে যাবে। তুই কাল যা বলেছিস বিলকুল ও তা-ই বলেছে।'

'তুমি ওকে কী বললে ?'

'বললাম, না, আমি তোর সাথ অসপাতাল যাব না। ভরোসাকে কথা দিয়েছি। তার সঙ্গেই যাব। হামনিকো এক জবান—মরদকা বাত। কথা যা দেব তা থেকে ডাইনে বাঁয়ে কোনো দিকে হেলব না। কা, আচ্ছা কিয়া তো ?'

ব্যস্তভাবে নাথ্‌ুলাল বলে ওঠে, 'হাঁ-হাঁ, বহোত আচ্ছা কিয়া।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর নাথ্‌ুলাল বলে ওঠে, 'বুঝতে পারছি না, আমাকে দেখ-ভাল করার জন্যে সবাই এত ক্ষেপে উঠল কেন ?'

ভরোসারাম উত্তর দেয় না।

দেখতে দেখতে রোদ উঠে যায়। এখনও মাঘ শেষ হয়নি। তাই সূর্যের তাপ কম। তা ছাড়া উল্টোপাল্টা ঠাণ্ডা উত্তুরে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে।

রোদে চৈত বৈশাখের মতো গনগনে তেজ থাকলে একটা জ্যান্ত মানুষকে কাঁধে চড়িয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে জিভ বেরিয়ে যেত।

ত্ব'ধারে ফাঁকা ধানক্ষেত, সবন গাছের ঝোপ, ট্যারাবাঁকা চেহারার সীসম আর কড়াইয়া গাছ, মজা নহর, নহরের ওপর বাঁশের সাঁকো, মাথার ওপর চোটা আর পরদেশী শুগার ঝাঁক। মাঝে মাঝে ত্ব'একটা হতচ্ছাড়া চেহারার দেহাতী গাঁ।

চলতে চলতে একসময় মনঃস্থির করে ফেলে ভরোসারাম। এবার চুনাওর কথা জানিয়ে টাকার ব্যাপারটা পাকা করে নিতে হবে।

সামনেই ছোটখাটো একটা হাট দেখা যায়। দোকানপাট এবং মানুষের ভিড়ে জায়গাটা জমজমাট। সামনে এসে চালিসুদ্ধ্‌ু নাথ্‌ুলালকে একধারে নামিয়ে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেয় ভরোসারামেরা। তারপর হাট থেকে চানার ছাতু আর 'জিলাবি' কিনে আনে।

ছাতু গুলে তিনটে ডেলা পাকিয়ে একটা দেয় নাথ্‌ুলালকে, একটা

দেয় শিউনাথকে, একটা নিজে নেয়।

খেতে খেতে ভরোসারাম বলে, 'একগো বাত নাথ্‌ু চাচা—'

'কা ?' ছাতু চিবোতে চিবোতে মুখ তুলে তাকায় নাথ্‌ুলাল।

'জানো তো আবার চুনাও আসছে—'

'কব্ ?'

'দেড় মাহিনা পরে।'

নিরাসক্ত ভঙ্গিতে গলার ভেতর থেকে একটা আওয়াজ বার করে নাথ্‌ুলাল, 'অ—'

ভরোসারাম খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। টাকার কথাটা কীভাবে পাড়বে, মনে মনে ঠিক করে নেয়। তারপর গলা খাকরে একসময় চোখ কান বুজে বলেই ফেলে।

আগের মতই নিস্পৃহ থাকে নাথ্‌ুলাল। বলে, 'অব সমঝ গিয়া—'

'কা সমঝা ?'

'কেন তুই আমাকে এত খাতিরদারি করছিস। এত তকলিফ করে কেন কাঁধে চড়িয়ে অসপাতাল নিয়ে যাচ্ছিস।'

ভরোসারাম উত্তর দেয় না। দম বন্ধ করে নাথ্‌ুলালের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার ভয়, বুড়োটা আবার বিগড়ে না যায়।

নাথ্‌ুলাল ফের বলে, 'বুঝতে পারছি এই ধান্দাতেই ভাওনাথও এসেছিল।'

ভরোসারাম এবারও চুপ।

নাথ্‌ুলাল থামেনি। সে বলতে থাকে, 'ঠিক হ্যায়, তুই যখন আমার দেখ-ভাল করতে চাইছিস, এত কষ্ট করে অসপাতাল নিয়ে চলেছিস তখন ভোটের রুপাইয়াগুলো তুই-ই নিস।'

মুখে হাসি ফোটে ভরোসারামের। চোখের তারার জেল্লা ছড়িয়ে যায়।

ছাতু খাওয়া হয়ে গেলে নাথ্‌ুলালকে কাঁধে তুলে আবার তারা হাঁটতে থাকে।

ভারী টৌন তুধলিপুরার অস্পাতালে পোঁছুতে পোঁছুতে তুপুর হয়ে যায়।

ডাক্তারসাব নাথ্‌লালকে ভাল করে দেখে ভরোসারামকে বলেন, 'বুড়োটাকে একেবারে খতম করে এনেছিস। এর বুকে তো কিছু নেই। একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।'

ভরোসারাম ভয়ানক ঘাবড়ে যায়। কাঁপা গলায় শুধোয়, 'ডাগদর সাব, আমার চাচা বাঁচবে তো?'

'বাঁচাবার চেষ্টা করব।' বলেই নাথ্‌লালের হাতে 'সুই' ফুটিয়ে ওষুধ ঢুকিয়ে দেন। তারপর ঘসঘস করে একটা কাগজে কী লিখে সেটা ভরোসারামের হাতে দিয়ে বলেন, 'তু'রকমের দাওয়া আছে। রোজ তিনবার করে খাওয়াবি। হাসপাতালেব দাওয়াখানা থেকে ওগুলো নিয়ে যা। আবার সাত রোজ পর বুড়োকে নিয়ে আসবি।'

মনে মনে ভবোসারাম ভাবে, যে ভাবেই হোক চুনাওর তারিখটা পর্যন্ত নাথ্‌লালকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে।

ওষুধ টোষুধ নিয়ে আবার নাথ্‌লালকে চালিতে চড়িয়ে সন্ধে নাগাদ মনকোহল গাঁয়ে ফিরে আসে ভরোসারামেরা। নাথ্‌লালকে তার ঘরে রেখে আসতে গিয়ে হঠাৎ সিদ্ধান্তটা বদলে ফেলে ভরোসারাম। না, ভাওনাথের মতো অনেক ভূচ্চরের ছোঁয়া আছে এ গাঁয়ে। ভোটের টাকাটার জন্য তারা নাথ্‌লালের মন ভাঙাতে পারে। কিন্তু সে সুযোগ দেবে না ভরোসারাম। সোজা সে তাকে নিজের ঘরে এনে তোলে এবং ঢাকা বারান্দায় থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। লখিয়াকে বলে, 'এখন থেকে নাথ্‌চাচা আমাদের এখানে থাকবে।'

প্রথমটা অবাক হয়ে যায় লখিয়া। হাতের ইসারায় স্বামীকে আড়ালে ডেকে নিয়ে চাপা গলায় বলে, 'কা, তোমার শির কি বিলকুল গড়বড় হয়ে গেল!'

'কী বলছিস তুই?'

'একটা আদমীকে এনে ঘরে তুললে! তার খোরাক জুটবে কোত্থেকে?'

ভরোসারাম তার তিসেবটা লখিয়াকে বুঝিয়ে দেয়। নাথ্‌লালের থাকাটা সাময়িক। চুনাও হয়ে গেলে একটা বেলাও তাকে থাকতে দেওয়া হবে না। যেতে না চাইলে লাথ মেরে ভাগিয়ে দেওয়া হবে। আর খোরাকি? নিজেদের ভাগ থেকে কিছু কিছু দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখা হবে। এ ভাবে দিলে গায়ে লাগবে না। তা ছাড়া তাদের ঘরে কিছু পেটের দানা থাকলেও নগদ পয়সার বড়ই অভাব। একসঙ্গে দশটা টাকা জোটানো তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। যেভাবেই হোক নাথ্‌লালের ভোটের দামটা তাকে পেতেই হবে। সে যদি বুড়ো ভিখমাঙোয়াটাকে ধরে না রাখে, গাঁয়ের অন্য হারামজাদারা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টেনে নিয়ে যাবে।

নাথ্‌লালের থাকার পক্ষে স্বামীর এই সব যুক্তি খুবই জোরালো মনে হয় লখিয়ার। কোথাও কোনো ফাঁক না পেয়ে সে বলে, 'ঠিক হ্যায়।'

এই মুহূর্ত থেকেই ভরোসারামের গোটা পরিবার নাথ্‌লালের খাতিরদারি শুরু করে দেয়। ঠিক সময়ে দাওয়া খাওয়ায়, ভাত-সব্জী দেয়।

এর মধ্যে একদিন দুবেজীর লোক এসে জানিয়ে যায়, ভোটের টাকাটা এখনই দেওয়া হবে না। চুনাওর দু রোজ আগে পাওয়া যাবে! হঠাৎ এই মত বদলের কারণ বোঝা যায় না।

সাত দিন পর আবার নাথ্‌লালকে চালিতে চড়িয়ে দুধলিপুরার হাসপাতালে যায় ভরোসারাম আর শিউনাথ।

বুড়োর বুকে নল বসিয়ে এবং পিঠে আঙুল ঠুকে ঠুকে অনেকক্ষণ পরীক্ষা করেন সরকারী ডাক্তারসাব। তারপর গম্ভীর মুখে যা বলেন তাতে উদ্বেগে বুকের ভেতরটা জমে যায় ভরোসারামের। সাত রোজ ওষুধ খেয়ে কিছুই হয়নি। বরং শরীরের হাল আরো খারাপ

হয়েছে। কতদিন নাথ্‌থুলালকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে, বলা মুশকিল। তিনি ওষুধের ব্যবস্থা করে আবার সাত দিন পর তাকে নিয়ে আসতে বলেন।

ভরোসারাম মনে মনে প্রার্থনা করে, 'হো রামজী, হো কিষুণজী, বুড়হা গিধটাকে দেড় মাহিনা বাঁচিয়ে রাখো।'

এরপর থেকে ফী সপ্তাহেই নাথ্‌থুলালকে দুধলিপুরার হাসপাতালে নিয়ে যেতে লাগল ভরোসারামেরা। কিন্তু এত গোলি (বড়ি) আর অন্য ওষুধ খাওয়া সত্ত্বেও কিছুই হচ্ছে না নাথ্‌থুলালের। বরং হাল দিন দিন আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে গলা দিয়ে তার খুনও উঠছে। যেদিন খুন ওঠে সেদিন নির্জীব হয়ে পড়ে নাথ্‌থুলাল। তখন ভরোসারামদের গোটা সংসারটা তার পাশে এসে জড়ো হয়। চোখেমুখে জগতের সবটুকু উৎকণ্ঠা নিয়ে কেউ নাথ্‌থুলালের বুকে হাত বুলোয়, কেউ ঠাণ্ডা পায়ে গরম কড়ুয়া তেল ডলে দেয়। কীভাবে আর একটু আরাম হবে, সে জন্য সবাই তটস্থ হয়ে থাকে। তার বাঁচা-মরার সঙ্গে ভরোসারামদের ভবিষ্যৎ যেন জড়িয়ে গেছে।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। একদিকে চুনাও, আরেক দিকে মৃত্যু, মাঝখানে নাথ্‌থুলাল। মৃত্যু যাতে চুনাওকে না ছুঁতে পারে সে জন্য ভরোসারামেরা তাকে দিনরাত পাহারা দিচ্ছে। বলা যায় মৃত্যুর সঙ্গে তাদের এক মারাত্মক অঘোষিত যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

কিন্তু ভোটের দামটা হাতে পাবার আগেই চুনাওর চার দিন আগে শেষ বারের মতো রক্তবমি করে মারা যায় নাথ্‌থুলাল।

সত্তর আশী বা একশো বছরের জীবনে তার একমাত্র সান্ত্বনা, চুনাওর দৌলতে মৃত্যুর আগে দেড়টা মাস ভরপেট খেতে পেয়েছে, ভরোসারামদের কাঁধে চড়ে হাসপাতালে যেতে পেরেছে।

চুনাওকে হাজার বার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অপার খুশিতে ভিখ-মাঙোয়া নাথ্‌থুলাল এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়।

[শিল্প ও সংস্কৃতি]

একটি সাধারণ মানুষের কাহিনী

এবার কিছু আগে আগেই এসে পড়েছে বৈজুলালেরা। বৈজুলালেরা বলতে মীরজাপুরের নৌটঙ্কীর দলটা। মেলা জমতে এখনও বেশ দেরী। একটু আগে এসে তাঁবু টাঙিয়ে সামিয়ানা খাটিয়ে বসতে পারলে অনেক সুবিধে। অবশ্য মেলায় জায়গা পাওয়া নিয়ে দুর্ভাবনা নেই। কেননা এক বছরের মেলা শেষ হতে না হতেই পরের বছরেব জন্য জায়গা ইজারা করে রাখতে হয়। যখন হোক এলেই হল; বন্দোবস্ত করা জমি পাওয়া যাবেই। বৈজুলালদের জমি আগে থেকেই ব্যবস্থা করা আছে।

আগে আসার সুবিধেটা অন্য দিক থেকে। প্রথমত, মেলায় কেমন লোকজন হবে এবং সেই অনুপাতে লাভের অঙ্কটা কীরকম দাঁড়াবে তার একটা আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, অন্য দলগুলো কীভাবে তৈরী হয়ে এসেছে, কোনো চমকপ্রদ পালা নামিয়ে বাজিমাত করে দেবে কিনা—গোপনে লোক লাগিয়ে এ-সবের হদিস পেলে নিজেদের পালাগুলো মেজে ঘসে জেল্লা ফুটিয়ে আরো আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। তাছাড়া প্রচারের একটা দিক আছে। ইদানীং সেটাই সব চাইতে বড় দিক। কাড়া নাকাড়া পিটিয়ে যে কানের পর্দা ফাটিয়ে দিতে পারবে তারই দিগ্বিজয়। উট ভাড়া করে, তার পিঠে মাইক তুলে হিন্দি ফিলিমের গানের ফাঁকে ফাঁকে দলের রঙিন হ্যাণ্ডবিল বিলি করাই একালের রেওয়াজ। অনেকে আবার উট এবং হিন্দি গানে খুশি না—ক্লাউনের সাজে কাউকে সাজিয়ে টাঙ্গায় তুলে

মেলাময় ঘোরাতে ঘোরাতে হ্যাণ্ডবিল ছড়াতে থাকে। মোট কথা যেভাবে হোক নজরে পড়া। আগে এসে যে যেমন জমি তৈরী করে রাখতে পারবে আখেরে তার তেমন লাভ। অর্থাৎ আগে এলে এখানে বাঘে খায় না; সোনা মেলে।

কুলে-শীলে নৌটঙ্কী জিনিসটা বাঙলাদেশের যাত্রাপালার কাছাকাছি। তার সঙ্গে ইদানীং থিয়েটারি ঢং মিশতে শুরু করেছে। একেবারে হাল আমলে আবার হিন্দি সিনেমার কিছু কিছু অনধিকার প্রবেশও ঘটে গেছে। একটি যৎসামান্য পালাকে ঘিরে এতে থাকে প্রচুর নাচ, প্রচুরতর গান এবং হাস্যরসের নামে অপর্যাপ্ত ভাঁড়ামি। খাঁটি জনতার জিনিস।

সাবেক আমলে বাঙলাদেশের যাত্রার দলগুলো ছিল মেয়েমানুষ বর্জিত। স্ত্রী-ভূমিকাগুলো পুরুষেরাই অভিনয় করত। নৌটঙ্কীতে কিন্তু বিপরীত রীতি। পুরুষ এবং মেয়েমানুষ—দুই-ই এখানে পাওয়া যাবে। উভয়ের যৌথ নাচে-গানে-অভিনয়ে এই দলগুলো গড়ে উঠেছে।

নৌটঙ্কীর দলগুলোকে ডাকতে হয় না। সমস্ত উত্তর ভারতে অর্থাৎ আর্যাবর্তে যেখানে যত মেলা হয় সেখানেই রবাহূতের মত এরা হাজিরা দেয়। তারপর নেচে গেয়ে এবং ভাঁড়ামোর গাঁজলা রসে জনতাকে মাতিয়ে দিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে নিজেদের হিসেব বুঝে নেয়। এ-ই তাদের জীবিকা। তবে বড় দলগুলোর কথা আলাদা। তাদের আগে থেকে বায়না করে আনতে হয়।

যাই হোক, বৈজুলালেরা এবার যখন এখানে এল তখনও আকাশ থেকে কার্তিকের হিম ঝরতে শুরু করেনি। এখানে অর্থাৎ হরিহর ছত্রের মেলায়। গণ্ডকী আর গঙ্গা নদীর সঙ্গমে এই মেলাটির তুলনা সারা আর্যাবর্তে—শুধু আর্যাবর্তে কেন, সারা দেশ খুঁজেও পাওয়া যাবে না। ভারতের এটি সব চাইতে বড় মেলা। চলেও অনেকদিন ধরে; মেয়াদ পুরো একটি মাস।

বৈজুলালেরা যখন এল তখনও চারদিকে সাড়া পড়েনি। সবে মাত্র দু-চারখানি বয়েল গাড়ি কি ঘোড়ায় টানা টাঙ্গা আসতে শুরু করেছে। নইলে মেলার বিশাল শূন্য চত্বরটা তখনও খাঁ-খাঁ করছিল।

তারপর ধীরেসুস্থে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে বৈজুলালদের প্রকাণ্ড তাঁবু উঠল। তার ভেতর ঝালর-দেওয়া সামিয়ানা টাঙানো হল।

বৈজুলালদের তাঁবু আর সামিয়ানা বসতে বসতে মেলা সরগরম হয়ে উঠতে লাগল। প্রথম প্রথম সারাদিনে এক আধখানা বয়েল গাড়ি কি ঘোড়ায়-টানা টাঙ্গা আসছিল। এখন চারদিকে ধুলোর ঝড় উড়িয়ে গাড়ির পর গাড়ি আসছে। দিনের বেলা তো আসছেই; রাত্তিরেও আসার বিরাম নেই। শুধু কি বয়েল গাড়ি আর টাঙ্গাই, লরী পর্যন্ত আসছে। ফলে গঙ্গা-গণ্ডকীর সঙ্গমে এই মেলাটার মাথায় দিবারাত্রি সবক্ষণ ধুলোর মেঘ অনড় হয়ে আছে।

গাড়িগুলো আসছে আর যে যার নির্দিষ্ট জায়গায় ক্ষিপ্র হাতে তাঁবু তুলে দোকান সাজিয়ে ফেলেছে। ক'দিন আগেও মেলার যে চত্বরটা খাঁ-খাঁ করছিল, দেখতে দেখতে তার শূন্যতা ঘুচে যাচ্ছে। তাঁবুতে তাঁবুতে আর দোকানে দোকানে সমস্ত জায়গাটা এখন ছয়লাপ। কিন্তু এ সবই ভূমিকা। ক'দিন পর মানুষের ভিড়ে, চিৎকারে, হল্লায়, বিকিকিনিতে পুরো একমাসের মেয়াদে যে প্রমত্ত উৎসবটা শুরু হবে—এ হল তারই ভূমিকা। উপমা দিয়ে বলা যায়, দরবারী গানের আগে যে বিলম্বিত লয়ের আলাপ, এখন যেন তারই পালা চলছে।

বিচিত্র এক ঘোরের মধ্যে এবার মেলায় এসেছে বৈজুলাল। কিংবা বলা যায়, তুরন্ত আবেগের স্রোতে ভাসতে ভাসতেই বুঝি এসেছে।

মীরজাপুরের নৌটঙ্কীর দলটার সঙ্গে বিশ সাল এই মেলায় আসছে বৈজুলাল। প্রথম যেবার এসেছিল সে তিরিশ বছরের হট্টাকট্টা জোয়ান। হিসাব অনুযায়ী তার বয়স এখন পঞ্চাশ। তিরিশ

আর কুড়ির যোগফলেই শুধু পঞ্চাশ ; নইলে সময় বৈজুলালের গায়ে কোনো দাগ কাটতে পারেনি। দু-চারটে চুলের রঙ বদলানো আর মুখে অতিরিক্ত ক'টি আঁচড় দেওয়া ছাড়া বয়স যেন স্থির হয়ে আছে। এই পঞ্চাশেও তার পিঠ টান টান, বক পাথরের মতো নীরেট, হাত-পায়ের মোটা হাড়গুলোতে প্রচুর তাকত।

নৌটঙ্কী দলের সে মালিক না। বড় গাইয়ে বাজিয়েও নয়। তার কাজ হচ্ছে আসরের পেছন দিকে। নৌটঙ্কী দলে যত মানুষ আছে তাদের খেতে এবং স্নান করতে যে পরিমাণ জল দরকার, সবই দূর-দূরান্ত থেকে তাকে একাই বয়ে আনতে হয়। যেখানে যে মেলাতেই তাদের দল যাক, বৈজুলালকে জল বইতে হবেই।

প্রথম প্রথম এখানে আসার মধ্যে আনন্দ বা সুখ কোনোটাই ছিল না। নিতান্ত পেটের ভুখের জন্য এখানে আসত বৈজুলাল। কিন্তু গত দশ বছর ধরে এই আসাটার গায়ে ভিন্ ভাবের রঙ ধরেছে। রঙ ধরিয়েছে সেই মেয়েটা—যার নাম মোতিয়া।

মেয়ে! মোতিয়াকে কি আর মেয়ে বলা যায়? সে-ও তো চল্লিশ পার হতে চলেছে।

যাই হোক, বৈজুলালের এবারের আসাটা ব্যতিক্রম। মনে মনে সে স্থির করে ফেলেছে, এই মেলায় এটাই তার শেষ আসা। এখানে কেন, কোনো মেলাতেই সে আর যাবে না। নৌটঙ্কীর দল ছেড়ে দেবে বৈজুলাল। বানজারাদের মত ভেসে ভেসে বেড়াতে তার আর ভাল লাগে না। তার পঞ্চাশ বছরের জীবন এবার একটু বিশ্রাম চায়। মতিহারীর কাছে নিজেদের সেই গাঁওটিতে মোতিয়াকে নিয়ে এবার সে সংসার পাতবে। সে জন্য তৈরীও হয়ে এসেছে বৈজুলাল। নগদ তিন শ টাকা নিয়ে এবার মেলায় এসেছে সে।

তিন শ টাকা! টাকা তো নয়, ওগুলো মোতিয়ার মুক্তির দাম। কোমরের কাছে একটা গোপন থলেতে এক টাকার তিন শ

খানা নোট পাকিয়ে পাকিয়ে বেঁধে রেখেছে বৈজুলাল। সর্বক্ষণ ঐ টাকাগুলোকে যখের মত পাহারা দিয়ে চলেছে সে। এ জন্য তার চোখকান রক্তমাংস সর্বক্ষণ সজাগ।

আশেপাশে কেউ না থাকলে গেঁজেটা খুলে প্রায়ই টাকাগুলো গুনে গুনে ছাখে বৈজুলাল। তার ভয়, এই বুঝি ওগুলো খোয়া গেল। যখন দেখা যায় পুরোপুরি তিন শ'ই আছে তখন সে নিশ্চিন্ত।

টাকার ব্যাপারে বৈজুলালের সতর্কতার শেষ নেই। নিজের শরীরের সঙ্গে ওগুলোর স্পর্শ সে ধরে রেখেছে। এর মধ্য থেকে একটি পয়সা নিলেও কারো বেহাই নেই। পৃথিবীর যে প্রান্তেই সে যাক তার পিছু পিছু প্রেতের মত ধাওয়া করে যাবে বৈজুলাল।

তিন শ টাকা! এই টাকা দিয়ে মোতিয়ার মুক্তি কিনবে বৈজুলাল। শুধু মোতিয়ার মুক্তিই কি, সেই সঙ্গে নিজের সমস্ত জীবনের একটি রমণীয় সাধও কিনবে সে।

মোতিয়া! মোতিয়া! মোতিয়া!

মোতিয়াও নৌটঙ্কী দলের আওরত। তাদের দলটা অবশ্য ভিন্ন। তারা আসে সুদূর ভাগলপুর থেকে। আব বৈজুলালদের দলটা যায় মীরজাপুর থেকে। দশ বছর—অর্থাৎ প্রায় একযুগ আগে এই মেলাতেই মোতিয়ার সঙ্গে প্রথম জান-পয়চান বৈজুলালের।

নদীর কিনার ঘেঁষে যেখানে বৈজুলালদের তাঁবু পড়েছে ঠিক তার পাশের জায়গাটাই হচ্ছে মোতিয়াদের।

এ বছর মোতিয়ারা এখনও এসে পৌঁছয়নি। তাদের জায়গাটা খালিই পড়ে আছে। বৈজুলাল জানে, দু-চার দিনের মধ্যেই ওরা এসে পড়বে। সেই ক'টা দিনেরই শুধু অপেক্ষা। তারপরেই ওদের দলের মালিকের মুখে তিন শ টাকা ছুঁড়ে দিয়ে মোতিয়ার হাত ধরে সে চলে যাবে মতিহারীর কাছে তাদের সেই গাঁও-এ।

এবার মেলায় আসার পর থেকেই অন্যমনস্ক হয়ে আছে

বৈজুলাল। নৌটঙ্কী দলের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক কাটিয়ে মোতিয়াকে নিয়ে ঘর বাঁধবে—এই সুখের স্বপ্নটা বিচিত্র আচ্ছন্নতার মত তাকে যেন ঘিরে আছে। খাচ্ছে দাচ্ছে বৈজুলাল, ঘুরছে ফিরছে আর নৌটঙ্কী দলের লোকদের জন্য সারা দিন নদী থেকে জল তুলে আনছে। সব কিছুই সে করছে বিচিত্র এক ঘোরের মধ্যে। কখন—কখন ভাগলপুরের দলটা আসবে, সেই মুহূর্তটির জন্য বৈজুলাল একেবারে উদগ্রীব হয়ে আছে।

দিনরাত তো ধুলো উড়িয়ে গাড়ি আর মানুষ আসছে মেলায়। যখনই ভৈসা কি বয়েল গাড়ি আসতে দেখা যায় তখনই বৈজুলাল ছোটে। কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত গাড়িগুলো পাশের ফাঁকা জায়গাটায় এসে থামে না। অন্যদিকে চলে যায়।

ভাগলপুরের দলটা এখনও আসছে না। সেজন্য বৈজুলালের দুর্ভাবনা যে হয় না তা নয়। তবে সেটাকে আমল দেয় না সে। বৈজুলাল জানে, আজ হোক কাল হোক, ভাগলপুরের দলটাকে একসময় না একসময় আসতে হবেই। না এসে তারা পারবে না।

যতদিন ভাগলপুরের দলটা না আসছে ততদিন বৈজুলাল অনবরত মোতিয়াব কথা ভেবে যাবে। মোতিয়ার সঙ্গে প্রথম দিনের আলাপটার কথা বার বার মনে পড়ছে তার। শুধু কি প্রথম দিনের আলাপটাই, গত দশ বছরের খুঁটিনাটি সব কিছুই মিছিল করে চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

মেলার চিৎকার, হল্লা, মাথার ওপর অনেকটা জায়গা জুড়ে ধুলোর মেঘ—কিছুই, কিছুই যেন বৈজুলালের মনোযোগকে দোলা দিতে পারছে না। তার আচ্ছন্ন অস্তিত্ব জুড়ে এবার শুধু একটি মাত্র আওরতই রয়েছে। তার নাম মোতিয়া। মোতিয়ার সঙ্গে নিজের অতীত জীবনটা মনে পড়ে।

মনে পড়ে বিশ বছর ধরে এই মেলায় আসছে বৈজুলাল।

প্রথম দশটা বছর তার আসার মধ্যে কোনো আনন্দ ছিল না। থাকবেই বা কি করে ?

নৌটঙ্কীর দলের বৈজুলালের জীবন অনেকটা বান্ধুয়া মজুরের (বাঁধা মজুর) মত। খোরাকি আর মাসিক পঁচিশটা টাকার জন্য দিবারাত্রি এখানে তাকে জল টানতে হয়।

খোরাকি! সে শুধু নামেই। নইলে নৌটঙ্কী দলের সব লোকের খাওয়া হয়ে গেলে যা পড়ে থাকে তাতে পেটভরার কথা নয়। অন্তত সারাদিন অসুরের মত খাটুনির পর তো নয়ই। তবু এ দলেই তাকে পড়ে থাকতে হয়। কেননা, আধপেটা হলেও তো কিছু মেলে এখানে। নইলে ভুখাই মরতে হবে।

এমন সাধের চাকরিটাও ছ'মাসের বেশি থাকে না। অবশ্য বেশির ভাগ নৌটঙ্কীর দলই স্থায়ী; আর্যাবর্তের পাড়ায় পাড়ায় বছরের বারোমাসই টহল দিয়ে ফেরে। কিন্তু মীরজাপুরের দলটার রীতিনীতি আলাদা। দলের যিনি মালিক অর্থাৎ সীয়াশরণজীর মর্জি অন্যরকম। আশ্বিন থেকে ফাল্গুন—এই ছ'টা মাস ভ্রাম্যমাণ দল নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়ান। বাকি ছ'মাস দেশে ফিরে সংসার-ধর্ম পালন করেন। সুতরাং বাকি ছ'টা মাস পেটের ভুখের জন্য কি না করতে হয় বৈজুলালকে! কখনও সে হাটের কুলি, কখনও জনার কি ভুট্টা ক্ষেতের কৃষাণ, আবার কখনও একেবারে হাত-পা গুটনো বেকার।

প্রথম দশটা বছর প্রাণের মধ্যে অসীম ক্লান্তি নিয়ে এখানে যাওয়া-আসা করেছে বৈজুলাল। কিন্তু তার পরের দশ বছরে মেলায় এসে বৈজুলালের মনে হয়েছিল, জগতে তার চাইতে সুখী কেউ নেই। মনে হয়েছিল, তার প্রাণের সকল দিকে ঢেউ উঠেছে। পৃথিবীর রঙই বদলে গিয়েছিল বৈজুলালের চোখে।

সেবার মেলায় এসে বৈজুলালেরা অবাক। নদীর কিনার ঘেঁষে প্রতি বছর যেখানে তাদের তাঁবু ওঠে তার পাশের জায়গাটা এতকাল খালিই পড়ে থাকতে দেখা গেছে। কিন্তু সেবার দেখা গেল তারা

আসার আগেই সেখানে একটা তাঁবু বসেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছিল ওটাও একটা নৌটঙ্কী দল—আসছে সুদূর ভাগলপুর জেলা থেকে। এসেই উটের পিঠে হিন্দি গানের রেকর্ড বাজিয়ে আর হ্যাণ্ডবিল বিলিয়ে মেলা সরগরম করে তুলেছে।

খবরটা খুব প্রীতিকর নয়। পৃথিবীর আর যেখানেই সহাবস্থান সম্ভব হোক, নৌটঙ্কী দলগুলোর মধ্যে একেবারেই নয়।

একই পেশার দুটি দল পাশাপাশি তাঁবুতে থেকে জনতার মনোরঞ্জন করবে, এতখানি সহনশীলতা আর যার থাক মীরজাপুরের নৌটঙ্কী দলের মালিক সীয়াশরণজীর ছিল না। তীব্র বিদ্বেষে চোখদুটো কুঁচকে গিয়েছিল তাঁর। কপালে জটিল গভীর অসংখ্য রেখা ফুটে বেরিয়েছিল। দাঁতে দাঁত চেপে চাপা বিরক্ত সুরে তিনি বলেছিলেন, 'শালে ভূচ্চরের ছৌয়ারা!' যাদের উদ্দেশে এই মধুর সম্ভাষণ তাদের কান পর্যন্ত অবশ্য কথাগুলো পৌঁছয়নি।

আক্রোশটা যত প্রবলই হোক, সীয়াশরণজীর কিছু করার ছিল না। ভাগলপুর জেলার দলটাও তাদের মত নগদ কড়ি গুনে দিয়ে জমির বন্দোবস্ত নিয়েছে। আর যাই হোক, মেলা থেকে তাদের ওঠানো যাবে না।

ওঠানো না যাক, মনের ভেতর বিদ্বেষ পুষে রাখলে কেউ বাধা দেবার নেই। ভাগলপুরের দলটার ছোটখাটো ক্ষতি যে না করা যায় তা-ও নয়। মুখোমুখি যুদ্ধে না নেমে সীয়াশরণজী পেছন থেকে আক্রমণ শুরু করলেন। প্রথমত, নিজের লোকজনদের বলে দেওয়া হল, তারা যেন ভাগলপুরের দলটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দূরে থাক, মুখের কথাটিও না বলে। ওদের সঙ্গে যে কথা বলবে তিনি তাকে দল থেকে তাড়িয়ে দেবেন। দ্বিতীয়ত, ভাড়াটে গুণ্ডা যোগাড় করে দলটার পেছনে লেলিয়ে দিলেন তিনি। ফলে প্রায়ই দেখা যেতে লাগল রাতের অন্ধকারে ওদের তাঁবুর দড়ি কেটে সামিয়ানা সুদ্ধ হুড়মুড় করে পড়ে আছে। উটের পিঠে মাইক তুলে যখন ওরা

হ্যাণ্ডবিল ছড়াতে বেরুত তখন ঝাঁকে ঝাঁকে ইঁট গিয়ে পড়ত। কিংবা পালা চলার সময় দর্শকদের মধ্যে থেকে এমন খিস্তি খেউড়, চিৎকার আর টিটকিরি শুরু হয়ে যেত যে পালা বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া ওদের উপায় থাকত না।

শত্রুতাটা কোত্থেকে হচ্ছে দু-চার দিনের মধ্যেই তা টের পেয়ে গিয়েছিল ভাগলপুরের দলটা। সব জানার পর তারাও হাত-পা গুটিয়ে থাকেনি; বরং হাতিয়ারে শান দিতে বসেছিল। মেঘের আড়াল থেকে অগ্নিবাণ এলে সেটা ঠাণ্ডা করার জন্য পাল্টা বরুণবাণ তো ছুঁড়তে হবে।

অতএব দেখা যেতে লাগল, মীরজাপুরের তাঁবুর দড়িও কাটছে। টাঙ্গার ক্লাউন নিয়ে যখন তারা মেলা সরগরম করতে বেরুত তখন তাদের ওপরও ইঁট পড়তে লাগল।

যা ছিল আড়ালে, মনের অন্ধকার বিবরে, যা ছিল সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে, ক্রমশ পারার ঘায়ের মত ফুটে বেরুতে লাগল। দু পক্ষের রেষারেষিটা একদিন পর্দার পেছন থেকে বেরিয়ে এসে সদর রাস্তায় একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াল যেন। প্রকাশ্যেই তখন এক পক্ষ আরেক পক্ষের উদ্দেশে খিস্তি ছুঁড়ত। বিরুদ্ধপক্ষ উত্তরে যা বলত, আর যাই হোক তা শাস্ত্রের বাণী নয়। কথায় কথায় তাঁবু থেকে তারা লাঠি বার কবে আনত। এবং পবস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাদের আরক্ত চোখে যা ফুটে বেরুত তার নাম প্রণয় নয়।

দশ বছর আগে পাশাপাশি তাঁবু দুটো যেন নৌটঙ্কীর আসর নয়, দুটো দুর্গ কিংবা যুদ্ধশিবির।

দুই দলের এই উত্তেজনা, আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ—কোনো কিছুই বৈজুলালকে স্পর্শ করতে পারেনি। ওপর মহলে অর্থাৎ মালিকদের মধ্যে যে বিদ্বেষ চলছিল তা নিয়ে তার মাথাব্যথা ছিল না। সে ফুরসতই বা তার কোথায়?

জল বয়ে বয়ে বৈজুলালের কাঁধে উটের কুঁজের মত কড়া পড়ে গিয়েছিল। সারাদিন খাটুনির পর এমন উদ্যম আর অবশিষ্ট থাকত না যাতে ভাগলপুরের দলটার সঙ্গে যুদ্ধে নামা যায়। তখন তার ইচ্ছা করত পেট ভরে কিছু খেয়ে কোথাও না কোথাও অবসন্ন ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিতে।

কিন্তু মানুষের ইচ্ছা অনুযায়ী কি সব মেলে!

মনে পড়ে নদী থেকে জল তুলতে তুলতে সেদিন বিকেল হয়ে গিয়েছিল। ঠিক বিকেল নয়, বিকেল আর সন্ধের মাঝামাঝি জায়গায় সময়টা ছিল থমকানো।

সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি বৈজুলালের। পেটের ভেতর নাড়িগুলো যেন পাক খেতে শুরু করেছিল। তখনও মেলায় অন্ধকার নামেনি; পশ্চিমের ভাসমান মেঘে বেলাশেষের রক্তিম তীরগুলো আটকে ছিল। তবু বৈজুলালের মনে হচ্ছিল, সব কিছুই যেন ঝাপসা। কিছুই সে যেন বুঝতে পারছিল না। মেলার চিৎকার, হট্টগোল—সমস্তই নিরাকার আর নিরবয়ব হয়ে গিয়েছিল বুঝি। খিদের চোটে শুধু মনে হচ্ছিল, কানের কাছে ঝিঁঝিঁরা অবিরাম ডেকে চলেছে।

তাঁবুর সামনের দিকটায় নৌটঙ্কীর সামিয়ানা। পেছন দিকে একখানা তেরপল টাঙিয়ে তার তলায় রসুইয়ের ব্যবস্থা। মনে আছে, সোজা সেখানে চলে গিয়েছিল বৈজুলাল।

ভুনিরাম পণ্ডিতের ওপর ছিল রসুইখানার ভার। লোকটা নৌটঙ্কীর আসরে মন্ত্রী সাজে। তা ছাড়া ব্রাহ্মণ হওয়ার সুবাদে রান্নাবান্নার অতিরিক্ত দায়িত্বটা পেয়েছে। তাতে লোকসান হয়নি তার। মাইনে ছাড়াও রান্না বাবদে মাসিক আরো দশ টাকা বেশি পেয়ে থাকে।

যখন বৈজুলাল সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন ভুনিরামের হেঁসেলে সদাব্রত বন্ধ হয়ে গেছে। পেতলের বড় বড় বাসনগুলো ধুয়ে মুছে

সাজিয়ে রাখছিল সে।

বৈজুলাল বলেছিল, 'পণ্ডিত, খেতে দাও। ভুখের ঠেলায় আন্ধেরা দেখছি।'

'এ হে—হে—' বেতের মত পাকানো প্রৌঢ় শীর্ণ ভুনিরাম মাপা আধ হাত জিভ কেটে, তালুতে চুক চুক শব্দ করে বলেছিল, 'হো রামজী—'

বৈজুলাল অবাক হয়ে গিয়েছিল, 'কা হুয়া !'

কপালে চন্দনের তিলক, গলায় চাঁদির চৌকো তক্তি, পরনে একখানা চিটচিটে ফতুয়া আর হাঁটুঝুল ধুতি—এই হল ভুনিরামের সাজসজ্জা। মাথার চুল চামড়া ঘেঁষে নিরপেক্ষভাবে সমান করে ছাঁটা। তার মাঝখানে উদ্ধত একটা টিকি আকাশের দিকে খাড়া হয়ে আছে। লোকটা এবার মোহিনীমূর্তি ধারণ করেছিল। বিচিত্র মধুর হেসে বলেছিল, 'তোর খানা রাখতে বিলকুল ভুলে গেছি।'

কথাটা শেষ হতে না হতেই বৈজুলালের মনে হয়েছিল, মাথার ভেতর একটা শিরা বুঝি ছিঁড়ে গেছে। কিংবা কেউ বুঝি তার মুখে প্রচণ্ড এক ঘুষি মেরে দিয়েছে। ভরপেট খাদ্য কোনোদিনই তো মেলে না। তার ওপর মাঝে মাঝেই তার জন্য খাবার রাখতে ভুলে যায় ভুনিরাম। কী করবে, কী বলবে—সেই মুহূর্তে যেন বুঝে উঠতে পারেনি বৈজুলাল। শুধু একটা মূঢ় হিংস্র জানোয়ারের মত ভুনিরামের দিকে তাকিয়েছিল সে।

লোকটা দাঁত বার করে আবার বলেছিল, 'তা এক কাজ করিস, রাত্তিরে দু'বেলার খানা খাস।'

এবারও কিছু বলেনি বৈজুলাল। শুধু তার ইচ্ছা হচ্ছিল কবুতরের মত ভুনিরামের সরু গলাটা টেনে ছিঁড়ে ফেলে।

একটা দুর্ঘটনা সেদিন হয়তো ঘটে যেতে পারত কিন্তু তার আগেই রসুইখানা থেকে চলে গিয়েছিল ভুনিরাম। আর ধুলোর ওপর বসে পড়ে দুই হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে অসহ্য খিদেয় একটা

আহত রক্তাক্ত জন্তুর মত কাঁদতে শুরু করেছিল বৈজুলাল।

কান্নাটা একটানা কতক্ষণ চলেছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ এক সময় একটা স্নিগ্ধ গলার ডাক ভেসে এসেছিল, 'এ আদমী, এ—'

প্রথম বার খেয়াল করেনি বৈজুলাল। দ্বিতীয় বার ডাকটা কানে যেতেই চকিত হয়ে মুখ তুলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গিয়েছিল।

খানিকটা দূরে ভাগলপুরের দলটার রসুইখানা। বৈজুলালদের মতই তেরপল খাটিয়ে তাদেরও রান্নাবান্নার ব্যবস্থা। সেখানে তেরপলের তলায় দাঁড়িয়ে ছিল আওরতটা।

আগেও বার দুই-তিন তাকে দেখেছে বৈজুলাল। দেখেছে মাত্র, সে দেখার পেছনে আর কিছু ছিল না। নিস্পৃহ চোখে যেভাবে মানুষ গাছপালা বা মাঠঘাট ধানক্ষেত দেখে সেইভাবে আওরতটাকে দেখেছিল। নদীর জল বইতে বইতেই তো তার দিন যায় রাত আসে, রাত যায় দিন আসে। তবু এটুকু সে আন্দাজ করেছিল, ভাগলপুরের দলটার রসুইখানা ঐ মেয়েমানুষটির হাতে।

কত বয়স হবে তার? গোটা তিরিশেক তো বটেই। গায়ের রঙ মাজা মাজা। শক্ত ধাতের চেহারা।

খুঁতও আছে তার। মুখময় চেচকের (বসন্ত) দাগ; একটি চোখের ওপর সাদা সরের মত ছানি। এই ত্রুটিটুকু বাদ দিলে তাকে দেখতে ভালোই লাগে।

চোখাচোখি হতেই আওরতটা হাতছানি দিয়েছিল।

প্রথমটা বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে ছিল বৈজুলাল। তারপর পায়ে পায়ে আওরতটার কাছে চলে গিয়েছিল। তার চোখে চোখ রেখে ফিসফিসিয়ে বলেছিল, 'ডাকছ কেন?'

একটি পুরুষের চোখ তার চোখের ওপর। আওরতটা বুঝিবা বেশরম। সে নজর সরিয়ে নেয়নি। ঈষৎ ঝুঁকে বলেছিল, 'তুমহার ভুখ লেগেছে, না?'

তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়নি বৈজুলাল। চোখ নামিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছে, 'হ্যাঁ, লেকেন—'

'কী?'

'তুমি জানলে কী করে?'

আওরতটা হেসেছিল, 'তোমাদের পণ্ডিতের সঙ্গে কথা বলছিলে, এখান থেকে আমি শুনেছি। তারপর বসে বসে কাঁদছিলে, নিজের আঁখে দেখেছি। ভুখটা খুব জোর লেগেছে, তাই না?'

মুখ না তুলেই বৈজুলাল অস্ফুটে বলেছিল, 'হাঁ, বহুত জোর।' বলতে বলতেই হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সে, 'সুবে থেকে পানি বইতে বইতে জিন্দগী একদম চুর চুর হয়ে যায়। তার ওপর খানা যদি না মেলে, বল—এ শয়তানি ভাল লাগে কারো? হারামজাদ ভুচ্চর কহাঁকা!'

সে কথার উত্তর না দিয়ে আওরতটা বলেছিল, 'একটা কথা—'

'কী?'

'তুমহাকে যদি কিছু খেতে দিই, খাবে?'

সেই মুহূর্তে পেটের খিদেয় বৈজুলাল অবুঝ অবোধ পশু। অসঙ্কোচে সে বলেছিল, 'দিলে কেন খাব না? জরুর খাব।'

আর কিছু শুধোয়নি আওরতটা। বৈজুলালকে বসিয়ে একটা কলাই-করা থালায় খানকয়েক চাপাটি, অড়হরের ডাল আর সামান্য একটু পুদিনার চাটনি খেতে দিয়েছিল।

সেই সময়টায় ত্ব-দলের রসুইখানায় কোনো লোকজন ছিল না। ভুনিরাম পণ্ডিত তো আগেই মীরজাপুরের হেঁসেল থেকে চলে গিয়েছিল। খুব সম্ভব ভাগলপুরের দলটারও খাওয়া-দাওয়ার পালা চুকে গেছে। খাবার সময়টুকু বাদ দিলে তাঁবুর পেছন দিকে ত্ব-দলের কেউ বড় একটা আসে না।

পাওয়া মাত্র গোগ্রাসে খেতে শুরু করেছিল বৈজুলাল। আর মায়ের মত সস্নেহ দৃষ্টিতে তার খাওয়া দেখছিল আওরতটা।

আধাআধি খাবার পর খিদের তেজ যখন খানিকটা মরে এসেছে সেই সময় আবার কথা বলেছিল বৈজুলাল, 'তুমি আজ খেতে না দিলে জরুর মরে যেতাম।' কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সঠিক কী রীতি তা জানা নেই বৈজুলালের। সে বলে যাচ্ছিল, 'ভগোয়ান রামজী তুমহার ভালাই করবে।'

আওরতটা উত্তর দেয়নি। যেভাবে স্নেহময়ী মা শিশুর খাওয়া দেখে, তেমনভাবেই তাকিয়ে ছিল সে।

বৈজুলাল আবার বলেছিল, 'ঐ শালে গিধ্ধড়কে বচ্চে ভুনিরাম—দু-চার রোজ বাদ বাদই ভূচ্চরের ছৌয়াটা আমার জন্যে খানা রাখতে ভুলে যায়। আমি জানি, আমার খানাটা ও বেচে দ্যায়। দশ সাল নৌটঙ্কীর দলে ঢুকেছি। পেট ভরে কোনোদিন খেতে তো পেলামই না, তার ওপর মাঝে মাঝে পুরা ভুখা থাকতে হয়। এক এক সময় কী ইচ্ছা হয় জানো?'

'কী?' আওরতটা এবার মুখ খুলেছিল।

'দলের মাথায় তিন লাথ মেরে আর তিন বার থুক দিয়ে কোথাও চলে যাই।'

এ কথার উত্তরে আওরতটা কিছু বলেনি।

একটু চুপচাপ। খাওয়াটা যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে সেই সময় হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে গিয়েছিল বৈজুলালের। থালা থেকে তাড়াতাড়ি হাত গুটিয়ে সে বলেছিল, 'তাই তো—'

কিছুটা অবাক হয়ে আওরতটা শুধিয়েছে, 'কী?'

'এ তুমি কার খানা আমাকে দিলে?'

'যারই হোক, তুমি খাও দিকি।'

'নায়, বলতে হবে। বল এ কার খানা? জরুর তুমহার।'

'হাঁ, আমারই। তাতে কী হয়েছে?'

একটু ভেবে নিয়ে বৈজুলাল বলেছিল, 'তুমি ভুখা থেকে আমাকে খাওয়ালে!'

আওরতটা বলেছিল, 'অতশত তোমাকে ভাবতে হবে না। আওরতেরা খেতে দ্যায়, পুরুখেরা খেয়ে যায়। দুনিয়ায় এই হল কানুন। তোমাকে খেতে দিয়েছি, শির নামিয়ে খেয়ে যাবে। ব্যস্। কার খানা, কঁহাসে মিলি—অত কথায় তোমার কি দরকার?'

তবু বৈজুলালকে নিরস্ত করা যায়নি। আওরতটা যখন খাবার প্রস্তাব করে তখন তার জ্ঞান ছিল না। শুধু কি জ্ঞানই, লজ্জা-কুণ্ঠা-সঙ্কোচ—কিছুই না। পেটের খিদেয় তখন সে অবুঝ পশুর মত। খিদের তীব্রতা খানিকটা কমলে তার মধ্যে চেতনা ফিরে এসেছিল। জোর করেই বৈজুলাল জেনে নিয়েছিল, যে খাদ্য সে খাচ্ছে সেটা ঐ আওরতটারই। জানার পর লজ্জার শেষ ছিল না তার। বলেছিল, 'ছিঃ ছিঃ, এ তুমি কী করলে!'

'ঠিকই করেছি। আমার এখন ভুখ নেই।'

'ঝুট্ বলছ।'

'সচ্ বলছি, আমার ভুখ নেই।'

'সারা দিন গায়ের খুন পানি বানিয়ে রসুই করেছ, আর তোমার ভুখ লাগেনি—একথা আমাকে বিশ্বাস করতে বল?' জোরে জোরে প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বৈজুলাল বলেছিল, 'কভী নহী, কভী নহী।'

প্রসঙ্গটা এড়াবার জন্যই বোধহয় আওরতটা তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিল, 'তুরন্ত খেয়ে নাও। জানো তো তোমাদের দলের সঙ্গে আমাদের দলের দোস্তি নেই। যা আছে তা হল বিলকুল দুশমনি। আমি তোমাকে এখানে বসে খাওয়াচ্ছি—কেউ যদি দেখে ফেলে, দু'জনেরই খুব মুশকিল হবে।'

কথাটা মিথ্যে নয়। অতএব নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও দ্রুত হাত চালিয়ে বাকি রুটি ক'খানা শেষ করে উঠে দাঁড়িয়েছিল বৈজুলাল। আর সেই সময় আওরতটি জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোমার কী নাম?'

নিজের নাম বলে পাল্টা প্রশ্ন করেছিল বৈজুলাল, 'তোমার?'

'মোতিয়া।'

আওরতটি অর্থাৎ মোতিয়ার নাম জানা হলে আর কী বলবে, ভেবে পায়নি বৈজুলাল।

মোতিয়াই বরং আবার বলে উঠেছিল, 'একটা কথা বলছিলাম—'

'কী?'

'যখন খিদে পাবে আমার কাছে চলে আসবে।'

বৈজুলাল হেসেছিল, 'নিজেকে ভুখে মেরে আমার পেট ভরাবে তো?'

মোতিয়াও হেসেছিল, 'কী যে বল, তার ঠিক নেই। নিজে না খেয়ে রোজ রোজ তোমাকে খাওয়াব এত বড় দিল কি আমার আছে? তবে—'

'কী?'

'আমাদের দলের রসুইখানার ভার আমার হাতে, তা জানো তো?'

'জানি।'

'আমার যদি ইচ্ছে হয়, দু-চারটে লোককে খাইয়ে দিতে পারি। তাতে কারো খানায় টান পড়বে না। সমঝালে?' বলে চোখের একটা ইঙ্গিত করেছিল মোতিয়া।

ইঙ্গিতটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি বৈজুলালের।

সেদিন বৈজুলালকে নিজের ভাগের খাবার খাইয়ে একটা বিচিত্র খেলাই বুঝি শুরু করেছিল মোতিয়া। তারপর থেকে প্রায় রোজই সবার খাওয়া-দাওয়া সারা হলে এবং দু-দলের রসুইঘর নির্জন হয়ে গেলে বৈজুলালকে ডেকে নিয়ে যেত সে। ডেকেই খাওয়াতে বসাত।

খাবার ব্যাপারে বৈজুলাল যে খুব একটা উৎসাহশূন্য ছিল, তা নয়। তবে খেতে খেতে অত্যন্ত লজ্জা হত তার। বলত, 'রোজ রোজ এভাবে—'

মোতিয়া ধমক দিয়ে উঠত, 'তোমাকে আর সরমাতে (লজ্জা

করতে) হবে না। ভুনিরাম পণ্ডিত কী খেতে দেয়, নিজের আঁখে তা দেখেছি। এমন হট্টাকট্টা মরদ তুমি, তার ওপর জল টানার মেহনত। ঐ খেয়ে ক'দিন বাঁচবে? জরুর একটা বুখার ধরিয়ে বসবে।'

সহানুভূতির কথায় বুকের ভেতর ভাঙচুর শুরু হয়ে যেত বৈজুলালের। কৃতজ্ঞতায় চোখদুটি বুঝি ঝাপসা হয়ে আসত। গাঢ় কাঁপা গলায় সে বলত, 'জানো, তোমার মত এমন করে আমাকে আর কেউ কোনোদিন বলেনি। আর—'

'কী?'

'এমন করে আমাকে কাছে বসে কেউ কোনোদিন খাওয়ায়নি।'

'সচ্ বলছ?'

'হাঁ সচ্। রামজী কসম।'

'কেন, তোমার মা নেই?'

'নহী।'

'বহেন?'

'নহী।'

'তা হলে—' বলতে বলতে হঠাৎ থমকে যেত মোতিয়া।

'তা হলে কী? থামলে কেন? বল।' বৈজুলাল উদ্‌গ্রীব হত।

তৎক্ষণাৎ কিছু বলত না মোতিয়া। চোখ নামিয়ে অলস আঙুলে মাটিতে আঁকিবুকি কাটতে কাটতে ফিসফিসিয়ে উঠত, 'তুমি সাদি করনি?'

মোতিয়ার কথা শেষ হত কী হত না। মেলার ফেনায়িত হট্টগোলকে স্তব্ধ করে দিয়ে হো-হো করে হেসে উঠত বৈজুলাল।

মোতিয়া বলত, 'হাসছ যে?'

'তোমার কথা শুনে।'

'কী এমন হাসির কথাটা তোমাকে বলেছি?'

'হাসির কথা নয়?'

ভারী গলায় মোতিয়া বলত, 'জরুর হাসির কথা নয়।'

কৌতুক থামিয়ে গম্ভীর মুখে বৈজুলাল বলত, 'এমন একটা কথা তুমি কীভাবে ভাবতে পারলে তা-ই ভেবে আমি তাজ্জব বনে যাচ্ছি। আমার মত হতচ্ছাড়ার হাতে কোন্ বাপ লেড়কী তুলে দেবে বল? নৌটঙ্কীর দলে জল বয়ে বিশগো রুপাইয়া মেলে। তা-ও তো ছ'মাসের নৌকরি। ঐ রুপাইয়ায় নিজে খাব, না বহু পুষব?'

একটু থেমে মাথা নেড়ে আবার শুরু করত, 'না, কেউ নেই আমার। ইস্ ছুনিয়ামে কোঈ নহী হামনিকো। বাপ-মা-ভাই-বহেন-বহু—কেউ না। তিন বরিষ বয়সে মা মরেছে; পাঁচ বরিষে বাপকে খতম করেছি। তারপর বছর কয়েক এক চাচার কাছে ছিলাম। মনে আছে দিনের বেলা বিশটা ভঁইস চরাতে হত। রাত্তিরে চাচীর পা টিপতাম আর খেতাম মার—চাচা আর চাচী কথায় কথায় জুতি দিয়ে লকড়ী দিয়ে, হাতের কাছে যা পেত তা-ই দিয়ে বেদম ঠেঙাত। মারের চোটে পালিয়ে একদিন পটনা চলে গেলাম। সেখানে ঘোড়ার গাড়ির এক কোচোয়ানের নৌকর হয়েছিলাম। তারপর বনলাম টিশনের কুলী। তারপর আরো কত কী যে করেছি, সব মনে নেই। দশ সাল হল নৌটঙ্কীর দলে এসে ভিড়েছি। নায়, কোঈ নহী হামনিকা।'

কথায় কথায় নানা প্রসঙ্গ এসে যেত। মোতিয়া প্রশ্ন করত, 'মুলুক কোথায় তোমার?'

'ভাগলপুরের নজদিগ (কাছে)। গাঁও-এর নাম ছত্তরগঞ্জ।'

'সেখানে কে আছে এখন?'

উত্তর দিতে গিয়ে থমকে গিয়েছিল বৈজুলাল। বলেছিল, 'আমার কথাই তো খালি শুনছ। তোমার কোনো কথাই কিন্তু শোনা হল না। তোমার কথা বল—'

বিচিত্র হেসে মোতিয়া বলেছিল, 'আমার আবার কী কথা! শুনে লাভ নেই—'

'লাভ লুকসান আমি বুঝব। তুমি বল তো।'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলেনি মোতিয়া। অনেকক্ষণ পর আবছা গলায় শুরু করেছিল, 'তোমার জীওনের সাথ আমার জীওনের অনেকখানি মিল আছে।'

'ক্যায়সা ?' উৎসুক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল বৈজ্‌লাল।

মোতিয়া উত্তর দেয়নি। তার মুখের দিকে চেয়ে বৈজ্‌লাল অনুমান করেছিল, নিজের থেকে মোতিয়া কিছু বলবে না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে তার জীবনের কথা জেনে নিতে হবে। সে বলেছিল, 'ঘর কঁহা তুমনিকো ?'

'ভুই কোশী নদীর কাছে।'

'বাপ-মা ?'

'মালুম নহী।'

'ভাই-বহেন ?'

'মালুম নহী।'

'সাদি হয়েছিল ?'

'না।'

'উমর (বয়স) কত ?

'তিশ বরিষ।'

'এতগুলো বরিষ কাটল কীভাবে ?'

কী একটু চিন্তা করে মোতিয়া শুরু করেছিল, 'জ্ঞান হবার পর দেখেছি আমি এক দূর সম্পর্কের মামার বাড়ি আছি। দশ বারো সাল আমি ওখানেই ছিলাম। তারপর আমার উমর যখন পন্দর কি ষোল হল তখন মামারা নৌটঙ্কীর দলে তিন শ রুপাইয়ায় আমাকে বেচে দিলে। পয়লা পয়লা নৌটঙ্কীর দলে ভালই ছিলাম। গায়ের রঙ কালো হলেও দেখতে শুনতে খারাপ ছিলাম না; একটু আধটু গাইতেও পারতাম। আমাকে তালিম দিয়ে রাণী সাজিয়ে আসরে তোলা হত। এইভাবে ছে সাল যাবার পর হঠাৎ

আমার চেচক (বসন্ত) হল। তাতে একটা চোখ বরাবরের জন্তে নষ্ট হয়ে গেল ; মুখ ভর্তি গর্ত হল। আসর থেকে নামিয়ে আমাকে রসুইখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। ক'বরিষ ধরে নৌটঙ্কী দলের রসুই করে যাচ্ছি। এইভাবেই জীওন কেটে যাবে।'

শুনতে শুনতে বিচিত্র আবেগে বুকের ভেতরটা স্ফীত হয়ে উঠেছিল বৈজ্‌লালের। অবরুদ্ধ স্বরে সে বলেছিল, 'এখানে কত রুপাইয়া তলব (মাইনে) পাও ?'

'তলব পাব কেন ?' মোতিয়া বলেছিল, 'আমাকে তো ওরা কিনেই নিয়েছে।

অর্থাৎ মোতিয়া নৌটঙ্কী দলের বান্ধুয়া মজুর। পেটে ভাত বা রুটি আর পরনের খানকয়েক জামা-কাপড় ছাড়া আর কিছুই সে পায় না।

সেবার একটা মাস দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গিয়েছিল। মেলা ভেঙে গেলে সবাই যখন যাবার জন্য ব্যস্ত সেই সময় বৈজ্‌লাল বলেছিল, 'ক'টা দিন বেশ কাটল, না ?'

'হাঁ।' মোতিয়া মাথা নেড়েছিল।

'এখান থেকে তোমরা কোথায় যাবে ?'

'মোরাদাবাদেব মেলায়। তোমরা ?'

'আমরা উল্টোদিকে—সেই কাটিহার।' বৈজ্‌লাল বলেছিল, 'তা আসছে সাল আবার আসছ তো ?'

'মালিকরা জানে।' মোতিয়ার গলায় উদাস একটু সুর ফুটেছিল।

ঝাপসা গলায় বৈজ্‌লাল বলেছিল, 'আগেলা বছর যদি আস আবার দেখা হবে। নইলে এ-ই শেষ দেখা।' একটু হেসেছিল সে।

মোতিয়াও হেসেছিল। আর দু'জনেই অনুভব করেছিল, বুকের ভেতর কোথায় যেন কষ্ট হচ্ছে।

পরের বছরও এসেছিল মোতিয়ারা, তার পরের বছরও।

এখানকার মেলায় প্রতি বছর নিয়মিত তারা আসতে শুরু করেছিল।

মীরজাপুরের আর ভাগলপুরের—এই দুই দলের মধ্যে প্রথম বারের মত শত্রুতাটা আর প্রকাশ্য ছিল না। তারা বুঝতে পেরেছিল, শক্তিক্ষয় করলে উভয়েরই ক্ষতি। তাই সম্ভবত, দু-দলের মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি হয়ে গিয়েছিল। মনে মনে যা-ই থাক, সামনাসামনি কেউ কাউকে আঘাত হানছিল না। নির্বিঘ্নেই দু-দলের প্রচার চলছিল, তাঁবুর দড়ি আর কাটা যাচ্ছিল না কিংবা দর্শকদের মধ্য থেকে খিস্তি-খেউড়ের ঢল নামিয়ে কেউ পালা ভাঙার চেষ্টাও করছিল না।

যাই হোক, মেলার হট্টগোল, হৈ-চৈ—সব কিছুর মধ্যে থেকেও একটি নিভৃত কোণে দুটি মানব-মানবী বিচিত্র একটি খেলাঘর পেতে নিয়েছিল। এখানকার মেলার মেয়াদ পুরো একমাস। খেলাঘরটির আয়ুও তা-ই।

এই একটি মাসের জন্য মোতিয়া এবং বৈজ্‌লাল, দু'জনেই সারাটা বছর উন্মুখ হয়ে থাকত। সারা আর্যাবর্তে তারা টহল দিয়ে ফিরত বটে তবে তাদের উদ্‌গ্রীব দেহমন আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে গঙ্গা-গণ্ডকীর সঙ্গমেই পড়ে থাকত।

দীর্ঘ একটি বছর পর দেখা হলে পরস্পরকে নিয়ে কী করবে, মোতিয়া বা বৈজুলাল কেউ যেন বুঝে উঠতে পারত না। তাদের বুকের ভেতর পুরো এক বছরের কথা জমা হয়ে থাকত। দেখা হওয়ামাত্র একসঙ্গে সব বলে ফেলতে চাইত তারা। একটি বছর তারা কোথায় কোথায় ঘুরেছে, কীভাবে প্রতিটি দিন কেটেছে, একজন আরেকজনের কথা কতটা ভেবেছে—নাঃ, কথা তাদের ফুরোতে চাইত না।

কথা তো ছিলই, সেইসঙ্গে খাওয়ানোর সেই পালাটাও চলত।

মনে পড়ে প্রতি বছরই আগের বছরের তুলনায়, বৈজুলালের জন্য মোতিয়ার যত্ন বা সেবা এবং উৎকণ্ঠা বেড়ে যেত। অবশ্য

বৈজুলালের দিক থেকেও প্রতিদান ছিল। প্রতি বছরই মোতিয়ার জন্য কিছু না কিছু নিয়ে যেত সে। কোনোবার একখানা শাড়ি, কোনোবার হুটো জামা, কোনোবার আয়না-চিরুনি কি মাথায় দেবার তেল।

এইভাবেই তিন-চারটে বছর কেটে গেছে।

মনে আছে পঞ্চম বছরে যখন তাদের দেখা হল তখন মোতিয়া আঁতকে উঠেছিল, 'চেহারার এ কী হাল করেছ, বল তো?'

বৈজুলাল হেসেছিল, 'কেন, কী করেছি?'

'বিলকুল কমজোরি আর দুব্‌লা হয়ে গেছ।'

'কই, আমার তো মনে হয় না।'

'তোমার মনে না হলে কী হবে। আমার তো একটা আঁখ আছে।'

মনে পড়ে সেবার খাওয়াবার ঘটাটা কিছু বেড়েছিল। নৌটঙ্কী দলের মালিকদের জন্য যে দুধ, মাংস এবং ভাল ভাল সব্‌জির ব্যবস্থা আছে—সেখান থেকে কিছু কিছু সরিয়ে বৈজুলালকে খাওয়াতে শুরু করেছিল মোতিয়া।

বৈজুলাল বলত, 'তুমি খাইয়ে খাইয়ে আমাকে মেরে ফেলবে নাকি?'

মোতিয়া উত্তর দিত না।

একেক সময় খেতে চাইত না বৈজুলাল। তখন নতুন নতুন রূপ ফুটে উঠত মোতিয়ার। কখনও স্নেহময়ী জননী, কখনও অভিমানিনী প্রেমিকা, কখনও আবার অবুঝ বালিকা বধূ। কেঁদে, ধমকে, মুখভার করে—যে কোনো উপায়েই হোক, বৈজুলালকে খাওয়াত সে আর বলত, 'না খেলে শরীরটা সারবে কীভাবে আর পানি টানার মত গাধার খাটনি খাটবে কী করে?'

বৈজুলাল বলেছিল, 'একটা মাস না হয় তুমি আমাকে খাওয়ালে-দাওয়ালে, যত্ন করলে। তারপর?'

মোতিয়া বলেছিল, 'তারপর কী?'

'আবার তো সেই তখলিফ।' বৈজুলাল বলে গিয়েছিল, 'বছরে একটা মাস যত্ন করে তুমি আমার অভ্যেস নষ্ট করে দিচ্ছ। এই মেলা থেকে চলে যাবার পর যত্ন করার কেউ তো থাকে না। তখন কী খারাপ যে লাগে!'

মোতিয়ার মুখে এবার ছায়া পড়েছিল। সে বলেছিল, 'লেকেন—'

'কী?'

'একমাসের বেশি তোমার কাছাকাছি থাকব কী করে বল—'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করেছিল বৈজুলাল। তারপর সব দ্বিধা দু-হাতে সরিয়ে দিয়ে অস্থির কাঁপা গলায় বলেছিল, 'তুমি ইচ্ছা করলেই তো সব সময় আমার কাছে থাকতে পার।'

মোতিয়া কিছুটা অবাক স্বরেই বলেছিল, 'কী ভাবে?'

এবার এক কাণ্ডই করে বসেছিল বৈজুলাল। বিচিত্র ঘোরেব মধ্যে মোতিয়ার একখানা হাত ধরে বলেছিল, 'চল, আমরা কুথাও চলে যাই।'

হাত ছাড়িয়ে নেয়নি মোতিয়া। আস্তে আস্তে শুধু বলেছিল, 'লেকেন—'

'কা?'

'তোমাকে তো বলেছি, নৌটঙ্কী দলে আমাকে তিন শ' রুপাইয়ায় বিকিয়ে দিয়েছে। ঐ টাকাটা না দিলে দল থেকে আমাকে ছাড়বে না।'

'তিন শ রুপাইয়া!' স্বরটা এবার অত্যন্ত ক্লান্ত আর ম্লান শুনিয়েছিল বৈজুলালের।

'হাঁ।' মোতিয়া মাথা নেড়েছিল। তার গলায় বৈজুলালের ক্লান্তিই যেন সংক্রামিত হয়েছিল।

এর পর আর কিছু বলেনি বৈজুলাল। শুধু তার শিথিল মুঠি থেকে মোতিয়ার হাতটা খসে পড়েছিল।

তার পরের বছর দেখা হতেই বৈজুলাল বলেছিল, 'তিন শ রুপাইয়া.

পেলেই ওরা তোমাকে ছেড়ে দেবে তো ?'

মোতিয়া বলেছিল, 'হাঁ।'

সেবার এ নিয়ে আর কোনো কথা হয়নি। শুধু বৈজুলাল অনুভব করেছিল, এভাবে চলতে পারে না। এই মেলায় নারীসঙ্গময় একমাসের ক্ষণস্থায়ী জীবনটা তাকে পাগল করে তুলেছিল যেন। ক্ষণিকের সুখটাকে চিরকালের সাংসারিক একটা রূপ দেবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল সে। বৈজুলাল স্থির করেছিল, যেমন করে হোক, মোতিয়ার মুক্তির দাম তিন শ টাকা যোগাড় করবেই। সেজন্য প্রস্তুতও হচ্ছিল বৈজুলাল।

নৌটঙ্কীর দলে বৈজুলালের চাকরির মেয়াদ মাত্র ছ'মাস। বাকি ছ'মাস মুখে রক্ত তুলে অবিরাম পরিশ্রম করে গেছে সে। কুলী খেটে, জনারের ক্ষেতে কিষাণী করে কিংবা আরো পাঁচ রকম উঞ্ছবৃত্তিতে টাকা জমিয়ে যাচ্ছিল।

এই টাকা জমানোর কথাটা অবশ্য মোতিয়াকে জানায়নি বৈজুলাল। সে ঠিক করেছিল, মোতিয়ার মুক্তির দামটা পুরোপুরি তার হাতে এসে গেলে একেবারে অবাক করে দেবে। সরাসরি ভাগলপুরের দলের মালিকের মুখে টাকাটা ছুঁড়ে দিয়ে মোতিয়ার হাত ধরে চলে যাবে বৈজুলাল।

কয়েক বছর উদয়াস্ত পরিশ্রমের পর অবশেষে তিন শ টাকা জমানো সম্ভব হয়েছে। এ বছর সেই টাকা নিয়ে মেলায় এসেছে বৈজুলাল।

এখন বৈজুলালের বয়স পঞ্চাশ। জীবনের শেষ মাথায় পৌঁছে প্রাণের একান্ত সাধটাকে কিনে নিয়ে যাবে সে।

শুধু টাকাই জমায়নি বৈজুলাল। আরো একটা ব্যবস্থাও সে করে এসেছে। তাদের গাঁও-এ বড় ক্ষেতি মালিকের ক্ষেতে মজুরের একটা কাজও যোগাড় করে ফেলেছে। ভাঙাচোরা পৈতৃক ঘরখানা সারিয়ে-সুরিয়ে বাসযোগ্য করে রেখে এসেছে। মোতিয়াকে নিয়ে সেখানে

উঠবে সে।

কিন্তু—কিন্তু গঙ্গা-গণ্ডকীর সঙ্গমে এই মেলা এবার প্রায় জমে গেছে। তবু ভাগলপুরের দলটা এখনও এসে পৌঁছয়নি।

আসতে কারো কি বাকি আছে? মোরাদাবাদ থেকে পিতলের বর্তনওলারা এসেছে। গাজিয়াবাদ থেকে এসেছে তামার কারিগরেরা। আরো পশ্চিমে—দিল্লী লুধিয়ানা থেকে এসেছে উল-পশমের দোকানদাররা। দক্ষিণ ভারত থেকে এসেছে পাথরের মূর্তিওলারা। বাঙলা মুলুক থেকে এসেছে বেত আর বাঁশের মনোহারি সব দোকান। বোম্বাই মুলুক থেকে এসেছে ছাপা-শাড়িওলারা। নাগরদোলা, ঘুরনচৌকি, মাদারি খেল—কিছু আসতেই বাকি নেই। এমন কি ইলাহাবাদ আর লক্ষ্ণৌর বাঈমহল্লা থেকে তয়ফাওয়ালীরা পর্যন্ত এসে গেছে।

এই মেলার আরেক নাম 'হাতিঘোড়ার মেলা'। বিকিকিনির জন্য সেই হাতিঘোড়াও এসে গেছে। সমস্ত চত্বরটা আজকাল সর্বক্ষণ গম গম করতে থাকে।

সবাই এসে গেছে। শুধু আসেনি ভাগলপুরের দলটা। বৈজুলালদের পাশের জায়গাটা এখনও খালিই পড়ে আছে। অন্যান্য বছর বৈজুলালেরা আসার দু-চারদিনের মধ্যেই মোতিয়ারা এসে পড়ে। কিন্তু এবার তাদের পাত্তাই নেই।

বৈজুলাল অস্থির হয়ে উঠল। আরও দিনকয়েক দেখে, মেলাটা যখন পুরোপুরি জমে উঠেছে, সেইসময় ইজারাদারদের তাঁবুতে গিয়ে হাজির হল বৈজুলাল। কিন্তু সেখানে গিয়েও বিশেষ লাভ হল না। ভাগলপুরের দলটা এ বছর আসবে কি আসবে না—সে সম্বন্ধে কোনো খবরই দিতে পারল না ইজারাদাররা। শুধু তারা জানাল, গেল বছর দলটা জমির বন্দোবস্ত করে গেছে। সে জন্য তাদের বরাদ্দ অংশ এখনও

খালি পড়ে আছে।

আরো কয়েক দিন কাটল। কিন্তু না, মোতিয়ারা এল না।

বিচলিত উদ্‌ভ্রান্ত বৈজুলালের হঠাৎ মনে পড়ল, ভাগলপুর থেকে মোতিয়াদের দল ছাড়াও আরো একটা নৌটঙ্কীর দল এই মেলায় আসে।

কথাটা মনে হওয়ামাত্র আর অপেক্ষা করল না সে। মেলার আরেক মাথায় গিয়ে তাদের খুঁজে বার করল।

মোতিয়াদের দলের মালিকের নাম লছমনজী। লছমনজীর দলের কথা জিজ্ঞেস করতে এই দলের মালিক বলল, 'হা-হাঁ, ওদের আমি চিনি। লেকেন ও দল তো ভেঙে গেছে।'

'ভেঙে গেছে!' বৈজুলাল চমকে উঠল।

'হা। ছ'মাস আগে লছমনজী মারা গেছে। তার পরেই দলটা ভেঙে গেল।'

'এরা তা হলে আসবে না!'

'কী করে আসবে! দলই তো নেই।'

বৈজুলালের মনে হল, বুকের ভেতর শ্বাসটা যেন আটকে আসছে। হৃদ্‌পিণ্ড জমাট বেঁধে গেছে। অনেকক্ষণ পর রুদ্ধস্বরে সে বলল, 'আচ্ছা আপনি জানেন, ঐ দলে মোতিয়া বলে একটা আওরত ছিল; সে এখন কোথায়?'

'তা কী করে বলব! অন্য কোনো দলে টলে গিয়ে ভিড়েছে হয়ত।'

বৈজুলাল আর কোনো কথা না বলে বেরিয়ে পড়ল। মেলার মধ্য দিয়ে টলতে টলতে এলোমেলো বিশৃঙ্খল পায়ে হেঁটে চলেছে সে। মোতিয়ার নির্দিষ্ট কোনো ঠিকানা তার জানা নেই। ঠিকানা থাকলে তো জানা থাকবে। ভ্রাম্যমাণ নৌটঙ্কীর দলে ঘুরতে ঘুরতে বছরের শেষে একবার এখানকার মেলায় আসে সে। বছরে একবার মোতিয়ার সঙ্গে দেখা হবে—এটাকেই অমোঘ আর অভ্রান্ত বলে জেনেছিল বৈজুলাল। কিন্তু মোতিয়াদের দলটা যে ভেঙে যাবে,

কে তা ভাবতে পেরেছিল !

ভাগলপুরের ছু নম্বর দলের মালিক বলেছে, ছ'মাস আগে লছমনজীর দল ভেঙে গেছে। তা হলে এই ছ'মাস কোথায় আছে মোতিয়া ? কোথায় ? পৃথিবীর বিশাল অরণ্যে কোথা থেকে তাকে খুঁজে বার করবে বৈজুলাল ?

কোমরের কাছে গোপন সেই গেঁজেটায় তিন শ টাকা রয়েছে। চামড়ায় টাকাগুলোর স্পর্শ পাচ্ছে বৈজুলাল।

চামড়াতেই শুধু ; চেতনায় তা যেন দাগ কাটতে পারছে না।

মেলার ভিড় হট্টগোল চিৎকার—সব কিছুর ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে চলেছে বৈজুলাল। এত মানুষ, এত শব্দ—কিছুই যেন তাকে ছুঁতে পারছে না। তার চারদিক ঘিরে এই মুহূর্তে যেন আলো নেই, বাতাস নেই। এখন চারপাশে শুধু শূন্যতা আর অন্ধকার।